# বাংলাদেশ ২০২১ মানবাধিকার প্রতিবেদন

## সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, যেখানে বেশিরভাগ ক্ষমতাই ন্যস্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনা ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ তৃতীয় মেয়াদে পাঁচ বছরের জন্য বিজয়ী হন, যার মাধ্যমে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় থেকে যান। সিল মেরে ব্যালট বাক্স ভরা ও বিরোধী দলীয় পোলিং এজেন্ট ও ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ নানা অনিয়মের কারণে পর্যবেক্ষগণ মত দিয়েছেন, এই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি।

পুলিশ, সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও র‍্যাবসহ সন্ত্রাসদমন ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত নিরাপত্তা বাহিনী এ দেশে অভ্যন্তরীণ ও সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। সামরিক বাহিনী, মূলত সেনাবাহিনী, জাতীয় প্রতিরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত, যদিও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতেও তাদের কিছু দায়িত্ব রয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীগুলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন এবং সামরিক বাহিনী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন। আইনশৃংখলা বাহিনীর ওপর বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ছিল। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে বহু অপকর্মের অভিযোগ ছিল।

বিচারবহির্ভূত হত্যাসহ বেআইনি বা নির্বিচারে হত্যা; গুম, শারীরিক নির্যাতন বা নিষ্ঠুর ও অমানবিক বা অপমানজনক আচরণ অথবা সরকার বা সরকারের পক্ষে তার এজেন্ট কর্তৃক সাজা; কঠিন ও জীবনের জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী কারা পরিস্থিতি; নির্বিচারে গ্রেপ্তার বা আটক; রাজনৈতিক বন্দী; বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক কারণে প্রতিহিংসা; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে গুরুতর সমস্যা; নির্বিচারে বা বেআইনিভাবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তায় হস্তক্ষেপ; ব্যক্তির অপরাধের অভিযোগে পরিবারের সদস্যদের হয়রানি; সাংবাদিকদের ওপর সহিংসতা বা সহিংসতার হুমকি, অন্যায্য গ্রেপ্তার বা বিচার, সংবাদ প্রকাশে বাধা ও মানহানি আইনসহ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের ব্যাপক কণ্ঠরোধ; ইন্টারনেট স্বাধীনতার উপর ব্যাপক হস্তক্ষেপ; এনজিও ও সুশীল সমাজের কার্যক্রম, তহবিল ও সংগঠন বিষয়ক কঠোর আইনসহ শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সমাবেশের স্বাধীনতায় উল্লেখযোগ্য হস্তক্ষেপ; শরণার্থীদের অবাধ চলাচলে বাধাপ্রদান; শরণার্থীদের সঙ্গে অন্যায্য আচরণ; রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ওপর গুরুতর ও অযৌক্তিক বিধিনিষেধ; সরকারে গুরুতর দুর্নীতি;

স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোর ওপর সরকারের বিধিনিষেধ অথবা হয়রানি; পারিবারিক সহিংসতা, যৌন সহিংসতা, শিশু নিপীড়ন, জোরপূর্বক বাল্যবিবাহ এবং অন্যান্য ক্ষতিকর চর্চাসহ লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে তদন্ত ও জবাবদিহির ঘাটতি; সহিংসতা বা সহিংসতার হুমকিসহ ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার মানুষদের প্রতি সংঘটিত অপরাধ; সমকামী, উভকামী, ট্রান্সজেন্ডার, কুইয়ার, বা ইন্টারসেক্স ব্যক্তিদের ওপর সহিংসতা বা সহিংসতার হুমকিসহ তাদের প্রতি সংঘটিত অপরাধ; প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সম্মতিমূলক সমকামী যৌন আচরণকে অপরাধী করে এমন আইনের অস্তিত্ব বা ব্যবহার; স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিকদের সংগঠনের  স্বাধীনতার ওপর উল্লেখযোগ্য বিধিনিষেধ; এবং শিশুশ্রমের সবচেয়ে খারাপ রূপের অস্তিত্বসহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নির্ভরযোগ্য অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নিরাপত্তা বাহিনীর ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক দায়মুক্তির অভিযোগও রয়েছে। এসব বাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, নিপীড়ন ও বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনার অভিযোগের সামান্যই তদন্ত ও বিচারের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

## অধ্যায়-১: ব্যক্তির স্বতন্ত্রতার প্রতি শ্রদ্ধা

### ক. জীবনের অধিকার থেকে নির্বিচারে বঞ্চনাএবং অন্যান্য বেআইনি অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হত্যাকাণ্ড

সংবিধানে অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। তবে সরকার বা তার এজেন্টদের বিরুদ্ধে নির্বিচারে অথবা বেআইনি হত্যাকাণ্ডের অনেক অভিযোগ রয়েছে। পুলিশের বিধিমালায় বলপ্রয়োগের কারণে গুরুতর শারীরিক আঘাত বা মৃত্যুসহ সব ধরনের উল্লেখযোগ্য বলপ্রয়োগের ঘটনায় অভ্যন্তরীণ তদন্তের কথা বলা আছে। বিধিমালা অনুযায়ী সেই তদন্ত হয় পেশাদার ইউনিটের মাধ্যমে, যা সরাসরি পুলিশ মহাপরিদর্শককে প্রতিবেদন দেবে। কিন্তু সরকার আইনশৃংখলা বাহিনীর হাতে নিহতের সংখ্যা প্রকাশ করেনি বা এসব হত্যাকান্ড তদন্তে ব্যাপক পদক্ষেপও নেয়নি। মানবাধিকার সংগঠনগুলো এসব ঘটনার তদন্তকারী ইউনিটের  স্বাধীনতা ও পেশাদারত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে দাবি করেছে, নাগরিকেরা ন্যায়বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যে অল্পকিছু ঘটনায় সরকার অভিযোগ এনেছে বলে জানা গেছে তাতে দোষীসাব্যস্ত ব্যক্তিকে মূলত প্রশাসনিক সাজা দেওয়া হয়েছে।

বছরজুড়েই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অভিযান চালিয়েছে। বিশেষত এসব অভিযান পরিচালিত হয়েছে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, মাদক ও অবৈধ অস্ত্রের বিরুদ্ধে। কিছু

অভিযান, গ্রেপ্তার এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অন্যান্য অভিযানের সময় সন্দেহজনক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সংশ্লিষ্ট বাহিনী এ ধরনের মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রায়শই দায় অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, সন্দেহভাজনকে অপরাধ সংঘটনের জায়গা থেকে আটক করে হেফাজতে নেয়ার  পর অস্ত্র উদ্ধার কিংবা সন্দেহভাজন অপরাধীর সহযোগীদের ধরতে অভিযানে যাওয়ার পর পুলিশের ওপর গুলি চালানো হয়েছে; পুলিশও পাল্টা গুলি চালিয়েছে এবং বন্দুকযুদ্ধ চলাকালে সন্দেহভাজন আসামি নিহত হয়েছে। সরকার সাধারণত এ ধরনের মৃত্যুর ঘটনাকে 'বন্দুকযুদ্ধ' , 'ক্রসফায়ার' ও 'এনকাউন্টার' বলে অভিহিত করে। সংবাদমাধ্যমও পুলিশের আইনি বলপ্রয়োগকে বর্ণনা করতে এই শব্দটি ব্যবহার করেছে। মানবাধিকার সংগঠন ও সংবাদমাধ্যমের দাবি, অনেক ক্ষেত্রেই বন্দুকযুদ্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা ঘটেছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দাবি, কিছু ক্ষেত্রে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা সন্দেহভাজনকে আটক, জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্যাতন করে গ্রেপ্তারের স্থলে নিয়ে হত্যা করেছে এবং তারপর সেই হত্যাকে সহিংস হামলায় আইনসম্মতভাবে আত্মরক্ষার সময় মৃত্যু বলে বর্ণনা করেছে।

স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিস কেন্দ্র (আসক)-এর তথ্যমতে, এই বছর অন্তত ৮০জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে ৫১জন নিহত হয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে তথাকথিত বন্দুকযুদ্ধে। আসক-এর তথ্যমতে, ২০১৮ সালের মে থেকে ২০২১ সালের জুন মাসের মধ্যে ৬০৬টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

আরেক মানবাধিকার সংগঠন অধিকার-এর তথ্যমতে, জানুয়ারি থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৭১টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডেরঘটনা ঘটেছে। সেগুলোর মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে ৩৫টি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে ৩০ জন নিহত হয়েছে এবং ছয়টি হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। অধিকার-এর তথ্যমতে, ২০২০ সালে ২২৫টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, যা আগের বছরের তুলনায় কিছুটা কম। ২০১৯ সালে ৩৯১টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ঘটেছিল। মানবাধিকার সংগঠন ও সুশীল  সমাজ এসব বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ও গ্রেপ্তারের ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে দাবি করেছে, অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগী নির্দোষ ছিল।

স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন ও সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, জানুয়ারি থেকে জুলাইয়ের মধ্যে ১০জন রোহিঙ্গা শরণার্থী বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির এলাকায় অসম হারে  'বন্দুকযুদ্ধে'

হত্যার শিকার  গেছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি সংবাদমাধ্যম জানায়, কক্সবাজারে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ ‘জাকির বাহিনীর’ প্রধানসহ তিন রোহিঙ্গা নিহত হয়েছে। ১৬ জুলাই সংবাদমাধ্যম জানায়, র‍্যাব ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ লুৎফর রহমান ও হাশেম উল্লাহ নামের দুই রোহিঙ্গা অপরাধী নিহত হয়েছে। ১৯ জুলাই সংবাদমাধ্যম জানায়, কক্সবাজারে র‍্যাবের সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ কলিমুল্লাহ নামের এক রোহিঙ্গা শরণার্থী নিহত হয়েছে। এই সবগুলো ঘটনায় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সন্দেহভাজন অপরাধীদের ধরতে নিরাপত্তা বাহিনী অভিযান  চালিয়েছিল । ভুক্তভোগীদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। পরে তারা নিহত হয়।

সুশীল  সমাজ ও সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, ২৬ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সময় কমপক্ষে ১৯ জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছে (১. খ, ১.ঘ, ২.ক ও ৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

১৬ মে ব্যবসায়ী শাহীন উদ্দিন হত্যাকাণ্ডে সন্দেহভাজন দুই আসামি গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পর আইনশৃঙখলা বাহিনীর হাতে নিহত হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওই দুজনের বিরুদ্ধে শাহীন উদ্দিনকে তাঁর ছেলের সামনেই কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ ছিল। সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, সন্দেহভাজন দুজনের মধ্যে মো. মানিক নামের একজন র‍্যাবের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছে। দুদিন পর অপর সন্দেহভাজন মনির নিহত হয়েছে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে। শাহীন উদ্দিন নিহত হওয়ার পর ২০জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেছিলেন তাঁর স্ত্রী। মামলার আসামিদের মধ্যে সাবেক সাংসদ এম এ আওয়ালও রয়েছেন। জমি নিয়ে বিরোধের জেরে শাহীন উদ্দিনকে হত্যার নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগে ২০ মে র‍্যাব আওয়ালকে গ্রেপ্তার করে।

আগস্টে সংবাদমাধ্যম জানায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যার ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তদন্তের পর কর্তৃপক্ষ পুলিশের ২১ সদস্যকে বরখাস্ত এবং নয়জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে। কক্সবাজারে একটি তল্লাশিচৌকিতে ২০২০ সালে সিনহা গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। আইনশৃংখলা বাহিনী বলেছিল, সিনহা বন্দুক ‘তাক’ করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছে, পুলিশ গাড়ি থেকে বের হতে বললে সিনহা তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র গাড়িতে রেখেই

বেরিয়ে এসেছিলেন। সিনহা হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশ, বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বাড়াবাড়ি নিয়ে  সমালোচনার ঝড় ওঠে।

**খ. গুম**

মানবাধিকার সংগঠন ও সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, গুম ও অপহরণ অব্যাহত ছিল। এ ক্ষেত্রেও অভিযোগের তীর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দিকেই। স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তথ্যমতে, জানুয়ারি থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৮ জন গুম হয়েছে। সরকার গুম প্রতিরোধ, অভিযোগ তদন্ত কিংবা অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে খুব কম পদক্ষেপই নিয়েছে। সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর তথ্যমতে, গুম হওয়া ব্যক্তিদের বেশিরভাগই বিরোধী দলীয় নেতা, কর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বী। গুমের অভিযোগ ওঠার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কিছু ব্যক্তিকে ছেড়ে দিয়েছে, অন্যদের গ্রেপ্তার দেখিয়েছে। কিছু ব্যক্তিকে মৃতও পাওয়া গেছে। অন্যদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্যারিসভিত্তিক সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব হিউম্যান রাইটসের তথ্যমতে, কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যেও গুম অব্যাহত ছিল। গুম হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে বিরোধী রাজনীতিক, রাজনৈতিক নেতাকর্মী এবং সরকারের নীতি ও মহামারি মোকাবিলায় নেওয়া পদক্ষেপের সমালোচনাকারীরাও রয়েছেন। বিরোধী রাজনীতিকদের অভিযোগ, গুম হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করতে গেলেও পুলিশ অভিযোগ নেয়নি (অধ্যায় ২.ক দ্রষ্টব্য)।

পরিবারের সদস্যদের বরাত দিয়ে সুশীল সমাজ ও সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ২৬-২৮ মার্চ বাংলাদেশ সফরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও তার পরের রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় (অধ্যায় ১.ক, ১.ঘ, ২.ক, ২.খ ও ৬ দ্রষ্টব্য) আবু তোয়াহা মুহাম্মদ আদনানসহ বেশ কয়েকজন ইসলামি বক্তা, মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ও হেফাজতে ইসলাম সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন নিখোঁজ হয়েছে। নিখোঁজ কয়েকজনকে পরবর্তী সময়ে পাওয়া গেছে এবং তাদের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ (ডিএসএ) বিভিন্ন আইনে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

গুম হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের সংগঠন ‘মায়ের ডাক’ ১৯ জুলাই এক বিবৃতিতে সরকারের প্রতি গুম হওয়া ব্যক্তিদের পবিত্র ঈদুল আযহার আগে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানায়। সংগঠনটির তথ্যমতে, ২০০৯ সাল থেকে পাঁচ শতাধিক মানুষ নিখোঁজ হয়েছে দেশে। বিবৃতির তথ্যমতে, গুম হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে পরবর্তী সময়ে যারা ফিরেছে, তারা প্রতিশোধের ভয়ে মুখ খোলেনি।

আগস্টে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ গুমের ওপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যেখানে গুমকে বর্তমান সরকারের অধীনে আইন শৃংখলা বাহিনীর অন্যতম কৌশল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২০ সালের জুলাই থেকে ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত ভুক্তভোগী, ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্য ও প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে আগের দশকে ৮৬টি গুমের তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে নিখোঁজ ব্যক্তিদের খোঁজ আর পাওয়া যায়নি। প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে, এসব গুমের ঘটনা স্বীকার করে নিতে অথবা তদন্তে সরকারের অনীহা রয়েছে।

নভেম্বরে সাইবার ট্রাইব্যুনালে আলোকচিত্র সাংবাদিক ও বার্তা সম্পাদক শফিকুল ইসলাম কাজলকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে তিনটি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। এসব মামলা মার্চে হয়েছে। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে কাজলের মামলায় আদালতের শুনানি হওয়ার দিন ধার্য ছিল। কাজলকে ২০২০ সালে জোরপূর্বক আটক ও ৫৩ দিন সরকারি আটককেন্দ্রে রেখেছিলো বলে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে । মানহানির মামলায় কাজলকে ২৩৭ দিন কারাবন্দী থাকতে হয়েছে। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে তিনি জামিনে মুক্ত হন।

সেপ্টেম্বরে ইউএন ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্সড ডিজঅ্যাপিয়ারেন্সেস (ডব্লিউজিইআইডি) বাংলাদেশে গুম ও দায়মুক্তির অভিযোগগুলো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। ডব্লিইউজিইআইডি জানায়, তারা গুমের নিয়মিত অভিযোগ পেয়েছে, যেখানে গুম হওয়া ব্যক্তিদের বেশিরভাগই বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য। ২০১৩ সাল থেকে সরকার ডব্লিউজিইআইডি-এর তরফ থেকে প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশ সফরের অনুরোধে কোনো সাড়া দেয়নি।

## গ. নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা অবমাননাকর আচরণ অথবা সাজা

সংবিধান ও আইনে নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা অবমাননাকর আচরণ বা সাজা নিষিদ্ধ হলেও স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ও সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশ ও বেসামরিক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে কর্মরত সেনাসদস্যসহ সংশ্লিষ্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে নির্যাতন ও নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা অবমাননাকর আচরণ বা সাজার অভিযোগ রয়েছে। আইনে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদনে হেফাজতে সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদের (যা রিমান্ড নামে পরিচিত) নির্দেশনা রয়েছে, যেখানে আইনজীবীর অনুপস্থিতিতে সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগ রয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রেই রিমান্ডে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (প্রতিরোধ) আইনে কিছু

ভুক্তভোগী অভিযোগ করলেও তাদের হয়রানি ও হুমকির শিকার হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিছু ভুক্তভোগী ভয়ভীতির কারণে মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে।

ইউএন কমিটি এগেইনস্ট টর্চারসহ (সিএটি) একাধিক সংস্থার তথ্যমতে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে সন্দেহভাজন জঙ্গি ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য আদায়ে নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে লোহার রড দিয়ে পেটানো, হাঁটুতে আঘাত, বৈদ্যুতিক শক, ধর্ষণ ও অন্যান্য যৌন নিপীড়ন এবং হত্যার ভয় দেখানো। অনেক সংগঠন আরও দাবি করেছে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ঘুষ আদায়ে অথবা জোরপূর্বক জবানবন্দি নিতে নিয়মিতভাবে ব্যাপক হারে নির্যাতন চালিয়েছে, যেখানে কখনো কখনো মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে।

আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সুশীল সমাজ, মানবাধিকারকর্মী ও সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, র‍্যাব, বিজিবি, পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ, পুলিশ ও অন্যান্য ইউনিটসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে দায়মুক্তি একটি ব্যাপক সমস্যা। অপরাধের রাজনীতিকরণ, দুর্নীতি এবং জবাবদিহির ঘাটতি হেফাজতে নির্যাতনসহ অন্যান্য অপরাধের দায়মুক্তিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর অভিযোগ, পুলিশে নিপীড়নের অভিযোগের অভ্যন্তরীণ তদন্তের বিধান থাকলেও তদন্ত ব্যবস্থা স্বাধীন নয় এবং এর মাধ্যমে ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচার পায়নি। নিপীড়ন প্রতিরোধ করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বাড়তি কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

৪ জানুয়ারি সংবাদমাধ্যম জানায়, রেজাউল করিম রেজার পরিবারের সদস্যরা বলেছে, বরিশালে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার চারদিন পর তিনি পুলিশ হেফাজতে মারা গেছেন। মেডিকেল রিপোর্টের তথ্যমতে, আইনের শিক্ষার্থী রেজার মৃত্যু হয়েছে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে। তাঁর শরীরে অনেকগুলো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ এ ঘটনায় তদন্ত করেছে এবং বলেছে রেজা মারা গেছেন মাদকাসক্তিজনিত জটিলতায়। রেজার বাবার অভিযোগ, পুলিশ নির্যাতন করে তাঁর ছেলেকে মেরে ফেলেছে। তিনি ছেলে হত্যার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি সংবাদমাধ্যম জানায়, লেখক মুশতাক আহমেদ বিচারের আগে ১০ মাস কারাবন্দী থাকা অবস্থায় মারা গেছেন। মুশতাক আহমেদের বিরুদ্ধে কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় সরকারের পদক্ষেপের সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছিল (অধ্যায় ২.ক দ্রষ্টব্য)। ৩ মার্চ কারা মহাপরিদর্শক সাংবাদিকদের

জানান, মুশতাকের মৃত্যুর ঘটনায় 'কোনো ধরনের অবহেলার তথ্যপ্রমাণ পায়নি' তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি। ৪ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেন, স্বাভাবিক কারণে মুশতাক আহমেদের মৃত্যু হয়েছে এবং তাঁর শরীরে নির্যাতন বা আঘাতের দৃশ্যমান কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। মুশতাক আহমেদের সঙ্গে র‍্যাবের হাতে আটক হওয়া কার্টুনিস্ট আহমেদ কবীর কিশোরের তথ্যমতে, মুশতাককে 'প্রচন্ড মারধর'সহ 'ব্যাপক নির্যাতন' করা হয়েছে এবং তাঁর যৌনাঙ্গে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়েছে। র‍্যাবের মুখপাত্র লেফটেনেন্ট কর্নেল আশিক বিল্লাহ নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার এবং কিশোরের দাবি খারিজ করে তা 'মিথ্যা' বলে অভিহিত করেছেন। মুশতাক আহমেদের মৃত্যুর ঘটনায় দেশজুড়ে কয়েক সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভ হয়।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলার আসামি কিশোর ৪ মার্চ জামিনে মুক্ত হন। সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, মুক্তি পাওয়ার পর কিশোর যে আহত, তা দৃশ্যমান ছিল। ১০ মার্চ কিশোর ঢাকার একটি আদালতে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (প্রতিরোধ) আইনে করা মামলায় অভিযোগ করেন, তাঁকে ও মুশতাক আহমেদকে হেফাজতে নির্যাতন করা হয়েছে। পুলিশ রেকর্ড বলছে, কিশোর র‍্যাব-৩-এর হাতে ২০২০ সালের মে মাসে গ্রেপ্তার হয়েছেন। কিন্তু কিশোরের দাবি, তাঁকে ওই তারিখের তিনদিন আগেই বাসা থেকে সাদাপোশাকের লোকজন তুলে নিয়ে যায়। কিশোর তাঁর ওপর হওয়া নির্যাতনের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। বলেছেন, 'যখনই কোনো উত্তরে তারা খুশি হতে পারেনি, তারা আমার পায়ে, গোড়ালিতে, পায়ের পাতায় মেরেছে'। র‍্যাবের জিজ্ঞাসাবাদের সময় পেছন থেকে কেউ একজন মাথার দুই পাশ থেকে ক্রমাগত সজোরে চড় মেরেছে। কিশোর আরও বলেছেন, নিয়মিত ডায়াবেটিসের ওষুধ নেওয়ার প্রয়োজন থাকলেও বন্দী অবস্থায় তিনি সময়মতো ওষুধ সেবন করতে পারেননি। তিনি ডান কান দিয়ে রক্ত পড়া, বামহাঁটু ও গোড়ালিতে ব্যথা এবং হাঁটার সমস্যাসহ 'দীর্ঘমেয়াদি পার্শপ্রতিক্রিয়ায়' ভোগার কথা বলেছেন।

মার্চে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ এক বিবৃতিতে মুশতাক আহমেদের মৃত্যুতে 'দ্রুত, স্বচ্ছ ও স্বাধীন' তদন্ত, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধন, এই আইনের আওতায় আটক বা গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মুক্তি এবং কিশোরসহ অন্য বন্দীদের সঙ্গে অমানবিক আচরণের অভিযোগ তদন্তের আহ্বান জানায়। জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের মতে, র‍্যাবের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের অভিযোগ 'দীর্ঘদিন ধরে উদ্বেগের কারণ' হয়ে আছে।

১৪ মার্চ ঢাকার একটি আদালত পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) কিশোরের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের নির্দেশ দেন। ১৭ অক্টোবর সংবাদমাধ্যম জানায়, পিবিআই আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে, যাতে বলা হয়েছে, ১৬-১৭ জন সাদাপোশাকের অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্যাতনের বিষয়ে কিশোরের অভিযোগ, ২০২০ সালের মে মাসে এক বা একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁকে তুলে নেওয়ার এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করার অভিযোগের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ২৪ নভেম্বর কিশোর তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে অনাস্থা দিয়ে আবেদন করেন, যা আদালত গ্রহণ করেছেন।

নির্যাতনের শিকার ভুক্তভোগীদের সমর্থনে আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে ২৬ জুন ১০টি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এক বিবৃতিতে বলে, বাংলাদেশ সরকার নির্যাতন প্রতিরোধ ও এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে সিএটির ২০২০ সালের সুপারিশগুলো প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়েছে।

৩ জুলাই সংবাদমাধ্যম জানায়, কারাবন্দী ভারতীয় নাগরিক শাহজাহান বিলাশকে নির্যাতনের ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। প্রধান কারারক্ষীসহ কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের পাঁচ কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। ভিডিও ফুটেজ ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে আরও তিন কারাকর্মীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

একাধিক সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, বরিশাল জেলার উজিরপুর থানায় পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় নির্যাতন ও যৌন হয়রানির অভিযোগে পুলিশের তিন সদস্যসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে ৫ জুলাই নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (প্রতিরোধ) আইনে এক নারী মামলা করেছেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে একজন জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিমের আদালত জেলা পুলিশকে তদন্ত করার এবং ওই নারীর মেডিকেল রিপোর্ট ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দাখিলের নির্দেশ দেন। সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, জেলা পুলিশ অভিযুক্ত দুজন কর্মকর্তাকে থানা থেকে প্রত্যাহার করে এবং অভিযোগের তদন্ত শুরু করে। আদালতে স্থানীয় হাসপাতালের দাখিলকৃত প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই নারীর হাত, ঘাড় ও শরীরের অন্যান্য অংশে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যরা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

**কারাগার ও আটককেন্দ্রের চিত্র**

কারাগারের অবস্থা অত্যন্ত কঠিন। মারাত্মক জনাকীর্ণতা, অপর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা, শারীরিক নির্যাতন, দুর্নীতি, যথাযথ পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থার ঘাটতি এবং কোভিড-১৯ মহামারি সময় সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে পদক্ষেপ না নেওয়ায় সেখানকার পরিস্থিতি কখনও কখনও জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। দেশে কোনো বেসরকারি আটককেন্দ্র নেই।

স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন আসক-এর তথ্যমতে, জানুয়ারি থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬৭ জন বন্দী কারা হেফাজতে মারা গেছেন, যাদের ৪২ জন বিচারের অপেক্ষায় এবং ২৫ জন দোষীসাব্যস্ত হয়ে কারাবন্দী ছিলেন। সাবেক কারাবন্দীরা জানিয়েছেন, কিছু বন্দীর ক্ষেত্রে এমনও ঘটেছে, তাদের মৃত্যুর পর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

**ভৌত পরিস্থিতি:** কারা বিভাগের তথ্যমতে, দেশের ৪২ হাজার ৪৫০ জন বন্দীধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কারাগারগুলোয় এপ্রিল পর্যন্ত ৮৩ হাজার ৮৩৭ জনের বেশি বন্দী ছিল। কোভিড-১৯ মহামারিজুড়ে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ একটি নীতি বাস্তবায়ন করেছে, যেখানে কারাগারে আগত বন্দীদের করোনার উপসর্গ পর্যবেক্ষণ ও ১৪ দিন কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। অন্য যে করোনাবিধিগুলো মানা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে বাধ্যতামূলক মাস্ক পরা, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাতের পরিবর্তে প্রতি সপ্তাহে টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার ও অন্যান্য পদক্ষেপ। কারা সুপারিনটেনডেন্টরা বলেছেন, কোভিড-১৯ আক্রান্ত বন্দীদের আলাদা রাখার কোনো ব্যবস্থা তাদের ছিল না। ২২ জুন নাগাদ সরকার কেরানিগঞ্জ, ফেনী ও কিশোরগঞ্জে তিনটি কোভিড-১৯ আইসোলেশন কেন্দ্র খোলে। মুক্তি পাওয়া সাবেক কয়েকজন কারাবন্দী বলেছেন, অনেক কারাগারই কোভিড-১৯ আক্রান্ত প্রকৃত রোগীর চেয়ে কম সংখ্যা উল্লেখ করেছে। কর্তৃপক্ষ প্রায়শ বিচারের অপেক্ষায় থাকা আটক ব্যক্তিদের দোষীসাব্যস্ত কারাবন্দীদের সঙ্গে রেখেছে।

কারা বিভাগের পরিসংখ্যান বলছে, কারাচিকিৎসকের ১৪১টি পদের মধ্যে এপ্রিল নাগাদ ২৯টি খালি ছিল। এ ছাড়া নার্স ও ফার্মাসিস্টের অর্ধেক পদই সে সময় পর্যন্ত খালি ছিল। কর্মকর্তাদের তথ্যমতে, ৮৩ হাজার ৮৩৭ জন কারাবন্দীকে সেবা দিতে মাত্র আনুমানিক ১১ জন কারাচিকিৎসক ছিলেন। ফলে চিকিৎসাসেবা দিতে নার্স বা ফার্মাসিস্টদের ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ।

কারাগারের ভেতর বিভিন্ন জায়গার পরিস্থিতি অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন। কর্তৃপক্ষ কিছু বন্দীকে উচ্চ তাপমাত্রা, আলো-বাতাসের ঘাটতি রয়েছে এবং

জনবহুল জায়গায় আটক রেখেছে। আইনের মাধ্যমে 'ডিভিশন এ'-প্রাপ্ত বন্দীদের, যাদের কারা কর্মকর্তারা 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (ভিআইপি)' বলে অভিহিত করেন, উন্নত থাকার জায়গা ও খাবার, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বেশি সাক্ষাতের অধিকার, তাদের সহকারী হিসেবে ভিআইপি নয় এমন বন্দিদের রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, কিছু ভিআইপি বন্দীকে কারাগারে বসেই ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা, বিপরীত লিঙ্গের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা এবং মহামারি সত্ত্বেও দর্শনার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

আইনে কিশোর বন্দীদের প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে আলাদা রাখার বিধান থাকলেও কর্তৃপক্ষ অনেক কিশোরবন্দীকেই বড়দের সঙ্গে রেখেছে। আইন ও আদালত শিশুদের কারাদণ্ড নিষিদ্ধ করলেও কিছু শিশুকে (কিছু ক্ষেত্রে মায়ের সঙ্গে) কখনো কখনো বন্দী করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ নারী বন্দীদের পুরুষ বন্দীদের থেকে আলাদা রেখেছে।

মার্চে সংবাদমাধ্যম জানায়, যশোর কিশোর সংশোধানাগারের অন্তত পাঁচ শিশু আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে এবং আটজন পালিয়েছে। এপ্রিলে সংবাদমাধ্যম জানায়, ১৫ এপ্রিল থেকে ২২ এপ্রিলের মধ্যে কিশোর আদালত মহামারির সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে মোট ১৬৭ জন শিশুবন্দীকে জামিন দিয়েছেন।

জুলাইয়ে সংবাদমাধ্যম জানায়, যশোরে মানসম্পন্ন খাবার, পানি ও খেলাধুলার সরঞ্জামসহ অন্যান্য দাবিতে বিক্ষোভের সময় তিন কিশোর মারা গেছে। এ ঘটনা তদন্তে ও সেবার উন্নয়নের লক্ষে যশোরের ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) একটি কমিটি গঠন করেন। সংশোধানাগারের কর্মকর্তারা বলেছেন, ওই তিন কিশোর অন্য বন্দীদের সঙ্গে মারামারি করে মারা গেছে। তবে ঘটনার কয়েকদিন পর বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি সংশোধানাগারে নির্যাতনের অভিযোগ করে ওই কিশোরদের মৃত্যুর ঘটনায় পৃথক বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানায়। ২০২০ সালের আগস্টে একই সংশোধানাগারে তিন কিশোরের মৃত্যুর পর ওই বছরের সেপ্টেম্বরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের সব কিশোর সংশোধানাগারের ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনের সুপারিশ করেছিল। এক সাংবাদিক জানিয়েছেন, মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মার্চ পর্যন্ত সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, কিশোর সংশোধানাগারগুলো হেফাজতে থাকা কিশোরদের পুনর্বাসনে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। সেখানে এমন কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হয়েছে, যাদের কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের কোনো প্রশিক্ষণ নেই এবং যারা কিশোরদের বিশেষ

চাহিদাগুলোর প্রতি নজর না দিয়ে তাদের অপরাধীর দৃষ্টিতে দেখে সে অনুযায়ী আচরণ করেছেন।

৪ আগস্ট সংবাদমাধ্যম জানায়, নেত্রকোনায় ভ্রাম্যমান আদালতে এক মাসের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত দুই কিশোরকে আপিল আদালত খালাস দিয়েছেন। আপিল আদালত রুল জারি করেছেন, কিশোর অপরাধ বিচারের কোনো এখতিয়ার ভ্রাম্যমান আদালতের নেই।

মানসিক প্রতিবন্ধী কারাবন্দীদের জন্য ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখার ব্যবস্থা থাকলেও সব কারাগারে এই ব্যবস্থা নেই। আইনেও এমন ব্যবস্থা রাখার বাধ্যবাধকতা নেই। মানবিক বিবেচনায় বিচারকেরা চাইলে প্রতিবন্ধী বন্দীদের সাজা কমাতে পারেন। জেলাররাও চাইলে প্রতিবন্ধী বন্দীদের কারা হাসপাতালে স্থানান্তরের মতো বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারেন।

**প্রশাসন:** বন্দীদের অভিযোগ দেওয়ার কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা কারাগারে নেই। বন্দীদের অভিযোগ পাওয়ার জন্য কারাগারে কোনো ন্যায়পাল ছিল না। পুনঃপ্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি অত্যন্ত সীমিত।

**স্বাধীন নিরীক্ষণ**: সরকারি পরিদর্শক ও ক্ষমতাসীন দলের ঘনিষ্ঠ বেসরকারি পর্যবেক্ষকদের কারা পরির্দশনের অনুমতি দিয়েছিল সরকার। তবে এসব পরিদর্শনের বিষয়ে কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি। আন্তর্জাতিক রেডক্রস কারা মহাপরিদপ্তরকে সহযোগিতা দেওয়া অব্যাহত রেখেছে এবং দেশজুড়ে ৬৮ জন বন্দীকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহসহ বিভিন্ন সহযোগিতা এবং কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকারের আইসোলেশন কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা দিয়েছে।

## ঘ. নির্বিচারে গ্রেপ্তার বা আটক

সংবিধানে নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও আটক নিষিদ্ধ হলেও কোনো ব্যক্তি নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে বলে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হলে আইন কর্তৃপক্ষকে বিচারকের আদেশ বা পরোয়ানা ছাড়াই ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বা আটকের ক্ষমতা দিয়েছে। কর্তৃপক্ষের যদি সন্দেহ হয় কোনো ব্যক্তি গুরুতর অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাহলেও আইন বিচারকের আদেশ বা পরোয়ানা ছাড়াই তাকে গ্রেপ্তার ও আটকের ক্ষমতা দিয়েছে। সংবিধান যেকোনো ব্যক্তিকে তাঁর গ্রেপ্তার বা আটকের বিরুদ্ধে আদালতে আইনিভাবে চ্যালেঞ্জ করারও অধিকার দিয়েছে। তবে সরকার সাধারণত এই বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করে না। সংবাদমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অভিযোগ, কেবল সন্দেহভাজন জঙ্গিরাই গুম হচ্ছে না, সুশীল সমাজ ও বিরোধীদলীয় সদস্যরাও

গুম হচ্ছে। বন্দীদের অবস্থান প্রকাশ না করে অথবা পরিবার বা আইনজীবীকে অবস্থান না জানিয়ে কিংবা বন্দীকে গ্রেপ্তারের কথা স্বীকার না করে কর্তৃপক্ষের আটক রাখার হার দিন দিন বাড়ছে।

## গ্রেপ্তারের প্রক্রিয়া ও বন্দীদের সঙ্গে আচরণ

সংবিধানে গ্রেপ্তার ও আটকের ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কিংবা অপরাধ সংঘটনে সংশ্লিষ্টতা পাওয়ার বাধ্যবাধকতার কথা বলা থাকলেও আইনে এ বিষয়ে ব্যাপক ছাড় দেওয়া হয়েছে।

সংবিধান অনুযায়ী আটক বা গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিচারকের সামনে হাজির করতে হবে, কিন্তু এই বাধ্যবাধকতা নিয়মিতভাবে মানা হয়নি। জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকির আশংকায় সরকার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোনো ব্যক্তিকে ৩০ দিনের জন্য আটকাদেশ দিতে পারেন। তবে কর্তৃপক্ষ কোনো কোনো ক্ষেত্রে আটক বা গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে দায়মুক্তির সাথে দীর্ঘ সময় ধরে আটক রাখে।

জামিনের ব্যবস্থা থাকলেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অনেক সময়ই জামিন পাওয়া আসামিকে মুক্তির পরপরই অন্য মামলায় গ্রেপ্তার করে, যদিও সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ আদালতে হাজির করার আগে নতুন মামলায় পুনঃগ্রেপ্তারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

কর্তৃপক্ষ সাধারণত আদালতে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়েরের পরেই কেবল বিবাদীর আইনজীবীদের তাদের ক্লায়েন্টের সাথে দেখা করার অনুমতি দেয়, যা কিছু ক্ষেত্রে প্রাথমিক গ্রেফতারের কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পরে ঘটেছিল। বন্দিদের আইনি পরামর্শ পাওয়ার অধিকার রয়েছে এমনকি যদি তারা এর জন্য খরচ বহন করতে নাও পারে; কিন্তু এই সেবা প্রদানের জন্য দেশে পর্যাপ্ত তহবিলের ঘাটতি ছিল। অনেক আটক ব্যক্তিকেই অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগের অনুমতি দেওয়া হয় নি।

**নির্বিচার গ্রেপ্তার:** নির্বিচারে গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিক্ষোভ বা সভা-সমাবেশ বা বক্তব্য কিংবা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড রুখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পদক্ষেপের সময় এমন গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটে। আটক ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই সরকার আটক রেখেছে। কখনো কখনো তা করা হয় অন্য সন্দেহভাজনদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের বিস্তর পরিসর পূর্বের সংঘটিত কোনো অপরাধের ভিত্তিতে আটক করার নিয়মটি অপসারণ করায় তা এমন অনেক আটককে বৈধতা দেয় যা অন্যথায় বিচার বহিঃর্ভূত বলে গণ্য হত। মানবাধিকারকর্মীদের

দাবি, বিরোধী রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে পুলিশ মিথ্যা মামলা দিয়েছে এবং সরকার রাজনৈতিক বিরোধীদের দমনে সরকার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যবহার করেছে।

সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ২৬-২৮ মার্চ বাংলাদেশ সফরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের (অধ্যায় ১.ক, ১.খ, ২.ক, ২.খ ও ৬ দ্রষ্টব্য) পর পুলিশ ৩ হাজার ২৭০ জনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাত আরও কয়েক শ মানুষের বিরুদ্ধে ১৫৪টি মামলা করেছে। এসব মামলায় সন্ত্রাস, সহিংস কর্মকান্ড, সরকারি সম্পদের ওপর হামলা, দাঙ্গা, মারণাস্ত্র বহন এবং সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতিসাধনসহ বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), হেফাজতে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামিসহ বিরোধী দলীয় বিভিন্ন সংগঠনের ১ হাজার ২৩০ জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ বলেছে, বিক্ষোভে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ওই ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সুশীল সমাজের তথ্যমতে, ওই ব্যক্তিদের সিংহভাগকে যথেচ্ছভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি গ্রেপ্তার করা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। ৩০ এপ্রিল নাগাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলে ১ হাজার ৭০০ জন বন্দী ছিল, যার ধারণক্ষমতা ৬০০ জন।

অক্টোবরে সংবাদমাধ্যম জানায়, দূর্গাপুজার সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের একটি বিতর্কিত পোস্টকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া সহিংসতার ঘটনায় সরকারি কর্তৃপক্ষ কয়েক শ সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে (অধ্যায় ২.ক ও ৬ দ্রষ্টব্য)। রংপুরে কর্তৃপক্ষ ৬০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে, যাদের পরিবারের দাবি, ওই ব্যক্তিরা নিরপরাধ। গ্রেপ্তার আতঙ্কে সাতটি গ্রামের মানুষ আত্মগোপন করে। সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কিছু নেতা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর সহিংস হামলার ঘটনায় বিরোধী দল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর ওপর দায় চাপিয়েছে। কিছু বিএনপি নেতার দাবি, আওয়ামী লীগই এ ঘটনা ঘটিয়েছে। তাদের অভিযোগ, সরকার হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর হওয়া সহিংস ঘটনাকে বিরোধীদের দমনে ব্যবহার করছে।

**বিচারপূর্ব বন্দী**: কারা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যানের তথ্যমতে, কারাগারে থাকা বন্দীদের ৮০ শতাংশই বিচারের আগে আটক অথবা রিমান্ডে ছিল। আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা, সীমিত সংস্থান, বিচারপূর্ব বন্দীর নিয়ম প্রয়োগের অভাব এবং দুর্নীতির কারণে স্বেচ্ছাচারী এবং সুদীর্ঘ বিচারপূর্ব বন্দী অব্যাহত ছিল। জামিন পাওয়ার সুযোগ কম রাখা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো যথেচ্ছ ও কঠোর আইনের অতিব্যবহার বিচারের আগে আটক বন্দীদের বিপুল আরেকটি

কারণ বলে উল্লেখ করেছেন আইনজীবীরা। কিছু ক্ষেত্রে সংঘটিত অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে ঘোষিত সাজার সমান সময় বা তার বেশি সময়ও বিচারের আগে আটক রাখার ঘটনা ঘটেছে।

### ঙ. ন্যায়বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত করা

আইনে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার কথা বলা থাকলেও দুর্নীতি ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতাকে সংকুচিত করেছে। সরকার সার্বিকভাবে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা অনুসরণ করেনি।

মানবাধিকার পর্যবেক্ষকেরা বলেছেন, বিচারক, সরকারি আইনজীবী ও আদালত কর্মকর্তারা অনেক ক্ষেত্রেই ঘুষ দাবি করেছেন অথবা আদালত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষক নেটওয়ার্কগুলির প্রভাব বা আনুগত্যের ভিত্তিতে রায় দিয়েছে রায় দিয়েছেন। পর্যবেক্ষকদের দাবি, সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া বিচারকেরা বদলির ঝুঁকিতে পড়েছেন। কিছু মামলায় কর্তৃপক্ষ আইনজীবীদের বিবাদীর পক্ষে আইনি লড়াই করতে নিরুৎসাহিত করেছে।

দুর্নীতি এবং যথেষ্ট পরিমাণ মামলা জমে থাকার ফলে আদালত ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়, এবং ধারাবাহিকতা বর্ধিত হওয়ায় অনেক বিচার প্রত্যাশী ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হয়। সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, মহামারির সময় অনেক আদালতের কার্যক্রম বন্ধ ছিল। কিছু আদালত ভার্চ্যুয়ালি খোলা ছিল। এতে মামলাজট আরও বেড়ে গেছে।

জানুয়ারিতে হাইকোর্ট মো. কামরুল ইসলামকে মুক্তির আদেশ দেন, যাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্ত করে দুর্নীতির মামলা করেছিল। হাইকোর্ট দুর্নীতি দমন কমিশনকে ভুল ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ আনায় তদন্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ২০০৩ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন কামরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ১৯৯৮ সালে জাল সনদপত্র দিয়ে কলেজে ভর্তির অভিযোগ আনে। ২০১৪ সালে আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেন। তবে ২০২১ সালের ২৮ জানুয়ারি তিনি খালাস পান।

### বিচার প্রক্রিয়া

সংবিধান ন্যায্য ও সুষ্ঠু বিচারের কথা বললেও বিচার বিভাগ সবসময় এই বাধ্যবাধকতা মানেনি। দুর্নীতি, দলীয় আনুগত্য ও দুর্বল মানবসম্পদ এর জন্য অনেকাংশে দায়ী।

রায়ের পূর্বে আসামীদের নির্দোষ বলে গণ্য করা হয়, তাদের আপিল করার অধিকার রয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের তাৎক্ষণিকভাবে এবং বিস্তারিত জানার অধিকার রয়েছে। আসামিদের সময় মতো বিচার পাওয়ার অধিকার নেই। অভিযুক্তদের অধিকার রয়েছে তাদের প্রকাশ্য বিচারে উপস্থিত থাকার। দুঃস্থ বিবাদীদের সরকার নিয়োজিত আইনজীবীর আইনি সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। বাংলা ভাষায় বিচার পরিচালিত হয়; যেসব বিবাদী বাংলা বুঝতে বা বলতে পারে না তাদের পক্ষে সরকার বিনামূল্যে অনুবাদের ব্যবস্থা করে না। বিবাদীদের আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে পর্যাপ্ত সময় পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বাদীপক্ষের আইনজীবী বা ওই পক্ষের সাক্ষীদের মোকাবিলা করার এবং নিজের পক্ষে সাক্ষী ও তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের অধিকার রয়েছে। তাদের দোষ স্বীকার না করার অধিকারও রয়েছে, যদিও যেসব আসামি দোষ স্বীকার করে না তাদের প্রায়শ হেফাজতে আটক রাখা হয়। সরকার এসব অধিকার প্রায়শই মানেনি।

নির্বাহী বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালতে তাৎক্ষণিকভাবে রায় ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে অনেক ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে আইনিভাবে নিজের পক্ষে যুক্তি ও তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ না দিয়ে কারাদণ্ডও দেওয়া হয়েছে। জুন মাসে হাইকোর্ট এক আদেশে বলেন, শিশুদের বিচার করার এখতিয়ার ভ্রাম্যমান আদালতের নেই।

## রাজনৈতিক কারাবন্দী ও আটক

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আটক বা গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া গেছে। বিরোধী দলের সদস্যদের, জাতীয় নিরাপত্তার হুমকির জবাবের অজুহাতে বানোয়াট অভিযোগে গ্রেপ্তার এবং মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংযুক্তি প্রায়শই একটি কারণ হিসেবে উপস্থিত ছিল। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সরকারের পদক্ষেপের সমালোচনা করা বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের পুরো বছরজুড়েই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সেপ্টেম্বরে সংবাদমাধ্যম জানায়, কর্তৃপক্ষ সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী রাজনৈতিক দল বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সাজা ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেছে। এর আগে ২০২০ সালের মার্চে খালেদা জিয়ার সাজা মানবিক বিবেচনায় শুরুতে ছয় মাসের জন্য স্থগিত করা হয়, তবে তিনি বাড়িতে বন্দী অবস্থায়ই ছিলেন। উভয় ঘটনায় সরকার অসুস্থ খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা নিতে বিদেশ যাওয়ায় বাধা দিয়েছে। সরকারের ভাষ্য, তাঁর চিকিৎসা ঢাকাতেই সম্ভব।

আগস্টে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়া বিদেশ যেতে পারবেন, যদি তিনি কারাগারে ফিরে আবেদন করেন। দুর্নীতি ও তহবিল তছরুপের অভিযোগে ২০১৮ সালে খালেদা জিয়ার ১০ বছরের কারাদন্ড হয়। মামলাটি হয় ২০০৮ সালে। আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সপক্ষে তেমন তথ্যপ্রমাণ ছিল না। তারা বলেন নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে বিরোধী দলীয় এই নেত্রীকে সরিয়ে দিতেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনে সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। এসব আইন বিশেষজ্ঞ আরও বলেছেন, বিচারপ্রক্রিয়ায় খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সার্বিকভাবে আদালতের কার্যক্রম ছিল ধীর।

## বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তিদের প্রতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতিহিংসা

**হুমকি, হয়রানি, নজরদারি ও বলপ্রয়োগ:** ৬ অক্টোবর সংবাদমাধ্যম জানায়, র‍্যাব যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বাংলাদেশি সাংবাদিক কনক সরওয়ারের বোন নুসরাত শাহরিন রাকাকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও মাদক মামলায় গ্রেপ্তার করেছে। রাকার সন্তানদের ৩০ ঘণ্টা আটক রাখার পর ছাড়া হয়। রাকা আটক রয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর জামিন আবেদন আদালতে শুনানির অপেক্ষায় ছিল। তিনি গ্রেপ্তার হওয়ার কিছুদিন আগে সংবাদমাধ্যম জানায়, রাকা স্থানীয় পুলিশকে বলেছিলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর নামে খোলা একটি ‘ভুয়া’ অ্যাকাউন্ট থেকে সরকারবিরোধী প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটিতেও ওই অ্যাকাউন্টের বিষয়ে অভিযোগ করেছিলেন, যা ওই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অপসারণ করা হয়েছিল। নভেম্বরে সংবাদমাধ্যম জানায়, পুলিশ ফেনী জেলায় কনক সরওয়ারের পরিবারের সম্পত্তি জব্দ করেছে। সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, সরওয়ার মনে করেন, অনলাইনে সরকারের সমালোচনা করে দেওয়া তাঁর নিজের বক্তব্যের কারণেই তাঁর বোনকে গ্রেপ্তার ও মামলা দেওয়া হয়েছে। সরওয়ারের দাবি, তাঁর বোন কোনো অপরাধ করেননি। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে হাইকোর্ট ‘রাষ্ট্রবিরোধী বিষয়বস্তু’ পোস্ট করার কারণে কনক সরওয়ারের ওয়েবসাইট বন্ধ করতে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

**কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার চেষ্টা**: কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্ট ৭ অক্টোবর জানায়, বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ইউরোপীয় শাখা স্টকহোমে বাংলাদেশি সাংবাদিক তাসনীম খলিলের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ করেছে। তাসনীম খলিল সুইডেনে রয়েছেন বলে জানা গেছে। খলিলের বিরুদ্ধে

‘বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভুয়াতথ্য ও গুজব ছড়ানোর’ অভিযোগ করা হয়েছে। ঢাকায় কর্তৃপক্ষ খলিলের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একই ধরনের অভিযোগ এনে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে, যদিও তিনি বাংলাদেশে নেই। কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্ট আরও জানিয়েছে, সশস্ত্র বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের সদস্যরা বারবার সিলেটে খলিলের মায়ের বাড়িতেও গেছেন। সেখানে তারা খলিলের মাকে ছেলের ওপর চাপপ্রয়োগ করতে বলেছেন যাতে তিনি তার কার্যক্রম বন্ধ করেন এবং তাঁর অবস্থান জানার চেষ্টা করেছেন। সরকার হাঙ্গেরিতে অবস্থানরত বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও সরকারের দুর্নীতির সমালোচনাকারী সামিউল ইসলাম খান সামির বিরুদ্ধেও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একই ধরনের মামলা করেছে (অধ্যায় ৪ দ্রষ্টব্য)।

## দেওয়ানি বিচার প্রক্রিয়া ও প্রতিকার

ব্যক্তি ও সংগঠন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিচারিক প্রতিকার চাইতে পারে। যদিও আদালত ব্যবস্থায় আস্থার সংকটের কারণে অনেকেই অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকে। আইনে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও এমন কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

## সম্পত্তি জব্দ ও পুনরুদ্ধার

সরকার প্রধানতহিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া তরান্বিত করতে ২০০১ সালের আইন বাস্তবায়ন করেনি। এই আইন সরকারকে রাষ্ট্রের শত্রুঘোষিত যেকোনো ব্যক্তির সম্পদ জব্দের ক্ষমতা দিয়েছে। এই আইন, বিশেষত ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর তাদের সম্পদ জব্দে প্রায়শ ব্যবহার হয়েছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো জমির মালিকানার বিরোধগুলো রিপোর্ট করা অব্যাহত রেখেছে, যেগুলো অনানুপাতিক হারে সংখ্যালঘুদের বাস্তুচ্যুত করে, বিশেষত নতুন রাস্তা বা শিল্প স্থাপনের অঞ্চলগুলোর কাছে যেখানে জমির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা এও দাবি করেছে যে স্থানীয় পুলিশ, সিভিল কর্তৃপক্ষ এবং রাজনৈতিক নেতারা কখনো কখনো উচ্ছেদ করার ক্ষেত্রে জড়িত ছিল অথবা রাজনৈতিক প্রভাবশালী ভূমি দখলকারীদের রক্ষক হিসেবে কাজ করেছে (অধ্যায় ৬, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা দ্রষ্টব্য)। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় (সিএইচটি) ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার মানুষদের জমির মালিকানা ফিরিয়ে দিতে ২০১৬ সালে একটি আইন সংশোধন করেছে। তবে জমি নিয়ে সমস্যা রয়েই গেছে।

## চ. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বাড়ি বা যোগাযোগের বিষয়ে যথেচ্ছ বা বেআইনি হস্তক্ষেপ

আইন ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করে না। গোয়েন্দা ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ওপর নজরদারি করতে পারে। তবে পুলিশ ব্যক্তিগত বিষয়ে নজরদারির ক্ষেত্রে খুব কমই আদালতের অনুমতি নিয়েছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো অভিযোগ করেছে, পুলিশ, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর সরকারের সমালোচনাকারী নাগরিকদের ওপর নজরদারি ও তাদের ব্যাপারে তথ্য পেতে তথ্যদাতাদের কাজে লাগিয়েছে।

কোভিড-১৯ ও মহামারি মোকাবিলায় সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত আলোচনায় চোখ রাখতে সরকার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক যোগাযোগের ওপর নজরদারি বছরজুড়ে ক্রমেই বাড়িয়েছে। মার্চে তথ্য মন্ত্রণালয় কোভিড-১৯ নিয়ে 'গুজব' ঠেকাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও টেলিভিশন নজরদারিতে একটি ইউনিট গঠনের ঘোষণা দেয়।

সুপ্রিম কোর্টের ১০ আইনজীবীর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ২২ জুন ঢাকার একটি আদালত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) ব্যক্তিগত ও টেলিফোন আলাপচারিতায় আড়িপাতা রোধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা প্রকাশের নির্দেশ দেন। আদেশে ১৬টি আড়িপাতার অভিযোগ পর্যালোচনার নির্দেশ দেওয়া হয়, যা এর আগে সংবাদমাধ্যমে খবর হয়েছিল। এসব ঘটনার কয়েকটিতে রাজনৈতিক বিরোধী দলের সদস্যদের ওপর আড়িপাতার অভিযোগ রয়েছে। সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, বিটিআরসি ওই নির্দেশ প্রতিপালন করেনি।

২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে হাইকোর্ট নাগরিকের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারের কথা উল্লেখ করে বলেন, অনুমতি ছাড়া ও ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে সরকারি-বেসরকারি টেলিফোন কোম্পানির কাছ থেকে কললিস্ট বা আলাপচারিতার বিবরণ সংগ্রহ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। রায়ে আদালত বলেন, 'এখন অডিও/ভিডিওসহ ব্যক্তিগত আলাপচারিতা ফাঁস হওয়া এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়া নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

## অধ্যায় ২: নাগরিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা

### ক. সংবাদমাধ্যম ও অন্যান্য মাধ্যমের সদস্যসহ সবার মত প্রকাশের স্বাধীনতা

সংবিধানে সংবাদমাধ্যম ও অন্যান্য মাধ্যমের সদস্যসহ সবার মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা হলেও সরকার প্রায়শই এই অধিকার রক্ষা করেনি।

অনলাইন ও অফলাইন- উভয় মাধ্যমে মত প্রকাশের স্বাধীনতা উল্লেখযোগ্য হারে সীমিত ছিল। সংবাদমাধ্যমের সদস্য ও ব্লগাররা হয়রানি ও প্রতিহিংসার শিকার হওয়ার ভয়ে সরকারের সমালোচনা থেকে নিজেদের সেন্সর করেছেন।

**মত প্রকাশের স্বাধীনতা:** সংবিধানের সমালোচনাকে সংবিধানে রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার সাজা ন্যুনতম তিন বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ।

আইনে বিদ্বেষপ্রসূত বক্তব্য প্রতিরোধের কথা বলা হলেও কোন ধরনের বক্তব্য বিদ্বেষপ্রসূত বক্তব্যের আওতায় পড়বে, তা স্পষ্ট করা হয়নি। এ কারণে সরকারের জন্য এই আইন ব্যাপক পরিসরে ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছে। সরকার চাইলে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং শৃঙ্খলা, শালীনতা অথবা নৈতিকতার প্রশ্ন তুলে; অথবা আদালত অবমাননা, মানহানি অথবা সহিংসতায় উসকানির অভিযোগ এনে মতপ্রকাশ সীমিত করতে পারে। সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের সমালোচনা এই আইনের আওতায় অপরাধ বলে পরিগণিত হয়।

সাইবার অপরাধ দমনে প্রণীত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে 'অপপ্রচারের' অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপর্যন্ত সাজার বিধান রাখা হয়েছে। ২০২০ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সরকার, জনপ্রতিনিধি, সেনা কর্মকর্তা, পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশের ভেতরে ও বাইরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘মিথ্যা, বানোয়াট, ভুয়া ও উসকানিমূলক বক্তব্য’ দেওয়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই নির্দেশনা না মানলে স্থিতিশীলতা ও অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থেআইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বছরজুড়ে সরকার মহামারি মোকাবিলায় নেওয়া পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তোলা ব্যক্তিসহ সমালোচনাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ব্যবহার করেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ওয়েবসাইট ও অন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে দেশের ভেতরে ও বাইরে থেকে মন্তব্যকারীদের বিরুদ্ধে এই আইনের ব্যবহার ক্রমেই বেড়েছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সরকার অন্যান্য বিধিনিষেধও জারি করেছে। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রস্তুতির ঘাটতির তথ্য সংবাদমাধ্যমে আসার পর স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের সংবাদমাধ্যমের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার ওপর বিধিনিষেধ দেওয়া হয়, যা ২০২১ সালেও ছিল।

মার্চে ঢাকা ট্রিবিউনে প্রকাশিত এক উপ-সম্পাদকীয়তে বলা হয়, ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও তথ্যযোগাযোগ আইনে দায়ের ২ হাজার ৪৫০টি মামলা রয়েছে। যার মধ্যে এ পর্যন্ত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের একটি মামলার রায় হয়েছে।

২ মার্চ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন যে সরকার ডিএসএ পর্যালোচনা করার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছে, এর অপব্যবহার ঠেকাতে একটি চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স সিস্টেম তৈরি করছে এবং পুলিশি তদন্তের আগে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার বা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের রোধে আইনটি পরিবর্তন করছে। মন্ত্রী প্রকাশ্যে আইনটির অপব্যবহার হওয়ার কথা স্বীকার করলেও ডিসেম্বর পর্যন্ত এর কোনো পর্যালোচনা করা হয়নি।

২৫ জুলাই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও অনলাইনে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে ২৪ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যাতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের স্বরূপ প্রকাশে মুশতাক আহমেদ ও আহমেদ কবির কিশোরসহ ১০ ব্যক্তির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৮ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের পর এই আইনে ২,০০০ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১,৩০০টির বেশি মামলা হয়েছে এবং প্রায় ১,০০০ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২০ সালের জুলাই পর্যন্ত শতাধিক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এই আইনে মামলা হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে অন্তত ৪০ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। প্রতিবেদনে উল্লেখিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলাগুলোর ৮০ শতাংশই দায়ের করেছেন আইনপ্রণেতা, ক্ষমতাসীন দলের সদস্য অথবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। সবগুলো মামলায়ই বিবাদীদের বিরুদ্ধে সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতিকদের সমালোচনা করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অনুশীলন করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের মামলাগুলো প্রত্যাহারে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

কারা বিভাগের তথ্যমতে, জুলাই পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ অন্তত ৪৩৩ জনকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তত ১৮৫ জনকে আটক করা হয়েছে অনলাইনে আপত্তিকর ও ভুয়া তথ্য প্রকাশের অভিযোগে। স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের (এমএসএফ) তথ্যমতে, অক্টোবর মাসে অন্তত ২১ জনকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

৩১ ডিসেম্বর স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন আসক জানায়, অন্তত ২১০ জন সাংবাদিক হয়রানি, শারীরিক নির্যাতন, হামলা, হুমকি ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলাসহ বিভিন্ন মামলার শিকার হয়েছেন। সংগঠনটি জানায়, বছরজুড়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অন্তত ১,১৩৪টি মামলা হয়েছে।

**সংবাদমাধ্যম ও অনলাইন মাধ্যমসহ অন্যান্য মাধ্যমের সদস্যদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা:** প্রিন্ট ও স্বাধীন অনলাইন সংবাদমাধ্যমগুলো সক্রিয় ছিল এবং বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে। তবে যেসব সংবাদমাধ্যম সরকারের সমালোচনা করেছে, তাদের ওপর সরকারের তরফ থেকে চাপ এসেছে। স্বাধীন সংবাদমাধ্যমগুলো স্বাধীনভাবে বা বাধাহীনভাবে কাজ করতে পারেনি।

সরকার দেশের সরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের ওপর সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রেখেছে এবং বেসরকারি চ্যানেলগুলোর ওপর সরকারি বিষয়বস্তু বিনামূল্যে প্রচার করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো বলেছে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ টিভির নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলেছে। উদ্যোক্তা ক্ষমতাসীন দলকে সমর্থন করে কি না, এই বিবেচনায় সরকার টেলিভিশন চ্যানেলের নিবন্ধন দিয়েছে। সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজের জানুয়ারিতে প্রকাশিত ‘বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের মালিক কারা’ শীর্ষক গবেষণায় বলা হয়েছে, পারিবারিক যোগসূত্র, রাজনৈতিক মতাদর্শ ও ব্যবসায়িক স্বার্থ দেশের মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপে মালিকানার ধরণকে আকৃতি দিয়েছে।দেশের ৩২টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন চ্যানেল ও ওয়েব পোর্টালসহ ৪৮টি গণমাধ্যমের মালিক। গবেষণার তথ্যমতে, ২০০৯ সাল থেকে যারা ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অথবা যাদের সরকারের প্রতি আনুগত্য ‘প্রশ্নাতীত’ কেবল তারাই টেলিভিশন চ্যানেলের নিবন্ধন পেয়েছেন।

১৭ মে সংবাদমাধ্যম জানায়, অনুসন্ধানী সাংবাদিক রোজিনা ইসলামকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি নিয়ে অনুসন্ধান চালানোয় তাঁর বিরুদ্ধে ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ও দণ্ডবিধির কয়েকটি ধারায় মামলা দায়ের ও তাঁকে গ্রেপ্তার করে সরকার। কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, রোজিনা ইসলাম মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক নথিপত্র চুরি করেন ও সেসবের ছবি তোলেন । সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, রোজিনা ইসলাম ঢাকার সচিবালয়ে এক অফিসে পাঁচ ঘণ্টা আটক ছিলেন। রোজিনার পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে শারীরিকভাবে হেনস্তা ও তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। ২১ মে সাংবাদিকসহ দেশের ৮৩ জন নাগরিক এক যৌথ বিবৃতিতে অবিলম্বে রোজিনার মুক্তি দাবি করেন। ঢাকার

একটি আদালত ১৫ জুলাই পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়ার পর ২৩ মে রোজিনা ইসলামকে মুক্তি দেওয়া হয়। সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর ভাষ্য, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় 'অভূতপূর্ব' চাপের কারণেই রোজিনা ইসলামকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

১৯ সেপ্টেম্বর, ঢাকার মুখ্য মহানগরী হাকিম আদালত রোজিনা ইসলামের পাসপোর্ট, দুটি মুঠোফোন ও সাংবাদিকতার পরিচয়পত্র ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন খারিজ করে দেন। গ্রেপ্তারের সময় তাঁর কাছ থেকে এগুলো জব্দ করা হয়েছিল। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রোজিনা ইসলামের বিরুদ্ধে মামলাগুলো চলমান ছিল। দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এমনকী মৃত্যুদণ্ড  পর্যন্ত হতে পারে। আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন ও সাংবাদিকেরা রোজিনা ইসলামের গ্রেপ্তার ও তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের মামলার সমালোচনা করে মামলাগুলো অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। স্থানীয় সংবাদপত্র প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক সরকারের প্রতি রোজিনা ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বলেন, রোজিনা ইসলামের প্রতি সংবাদপত্র, অনলাইন ও ইলেকট্রনিক সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের সমর্থন অভূতপূর্ব।

**সহিংসতা ও হয়রানি:** গোয়েন্দা সংস্থা ও ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনসহ কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের ওপর শারীরিক আক্রমণ, হয়রানি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছে, বিশেষ করে যখন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে। মানবাধিকারকর্মীদের মতে, সাংবাদিকদের ভয়ভীতি প্রদর্শনে সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এটি। সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদ বলেছে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পথ রুদ্ধ করেছে। এই বিষয়ে সংগঠনটির সদস্যরা সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তিরা গ্রেপ্তার হওয়ার হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, বিচারের আগে আটকে রাখা হয়েছে, ব্যয়বহুল ফৌজদারি বিচার, জরিমানা এবং কারাদণ্ডের পাশাপাশি অপরাধমূলক রেকর্ড থাকার সাথে জড়িত সামাজিক কলঙ্কের সম্মুখীন হয়েছে। সম্পাদক পরিষদের তথ্যমতে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপরাধ ও সাজা সম্পর্কিত ২০টি ধারার মধ্যে ১৪টিই অজামিনযোগ্য, পাঁচটি জামিনযোগ্য এবং একটি আলোচনা সাপেক্ষ। ৬ মার্চ সম্পাদক পরিষদ বলেছে, 'এটা বলা মোটেও অত্যুক্তি হবে না যে কিছু ক্ষেত্রে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগ আমাদের শঙ্কার চেয়েও উদ্বেগজনক। লেখক মুশতাক আহমেদকে তা জীবন দিয়ে প্রমাণ করতে হয়েছে।'

৬ জানুয়ারি রোহিঙ্গা শরণার্থী ও ফটোসাংবাদিক আবুল কালাম জামিনে মুক্ত হন। মিয়ানমার থেকে শরণার্থী হয়ে বাংলাদেশে ২৮ বছর বসবাস করা কালাম

গ্রেপ্তার হন বঙ্গোপসাগরে ভাসানচরে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্থানান্তর নিয়ে প্রতিবেদন করায়। কালামকে কক্সবাজারের থানায় নেওয়া হয়। সেখানে তাঁকে ৬০ ঘণ্টা আটক রেখে নিপীড়ন চালানো হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। আইনে অভিযোগের বিবৃতি ছাড়া পুলিশ হেফাজতে ২৪ ঘণ্টার বেশি না রাখার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

মার্চের ৪ তারিখ সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, হাইকোর্ট তার জামিন মঞ্জুর করার একদিন পরে এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর মন্তব্যের দুই দিন পর সরকারি কর্তৃপক্ষ কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোরকে ছয় মাসের জামিনে মুক্তি দিয়েছে । মহামারি মোকাবিলায় সরকারের পদক্ষেপের সমালোচনা করায় ২০২০ সালের মে মাসে কিশোর ও লেখক মুশতাক আহমেদকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় কারাগারে পাঠানো হয়। এর আগে কিশোর ও মুশতাক আহমেদের জামিন আবেদন ছয়বার প্রত্যাখ্যাত হয় । ২৫ ফেব্রুয়ারি মুশতাক কারাগারে থাকা অবস্থায় মারা যান। বিচারের আগে তিনি ১০ মাস আটক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে হেফাজতে মৃত্যুর প্রতিবাদে ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবিতে দেশজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। কিশোর অভিযোগ করেছেন, তাঁকে ও আহমেদকে হেফাজতে নির্যাতন করা হয়েছে (১.গ দ্রষ্টব্য)। ৫ মার্চ থেকে ৭ মার্চ রাজনীতিক ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে কিশোরের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের প্রতি তদন্তের দাবি জানায়। কিশোর ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের একই মামলায় আরও ছয় আসামি দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

জুলাইয়ে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে একটি ছবি প্রকাশ হয়, যেখানে এক সাংবাদিককে হাতকড়া পরা অবস্থায় চিকিৎসা নিতে দেখা যায়। কোভিড-১৯ আক্রান্ত ওই সাংবাদিককে ‘স্থানীয় হাসপাতালের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার’ অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় গ্রেপ্তারের পর চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়। ঠাকুরগাঁওয়ের একটি হাসপাতালে সরকারি অর্থায়নে রোগীদের জন্য খাবার সরবরাহে দুর্নীতি ও অনিয়মের ঘটনা নিয়ে প্রতিবেদন করায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় গ্রেপ্তার তিন সাংবাদিকের মধ্যে ওই সাংবাদিক একজন ছিলেন। গ্রেপ্তারের খবর জানাজানি হওয়ার পর স্থানীয় সাংবাদিকেরা প্রেসক্লাবে বিক্ষোভ করে তাঁর মুক্তি দাবি করেন। ওই সাংবাদিক জামিনে মুক্তি পেলেও তাঁর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলাটি রয়েছে।

**নিয়ন্ত্রণ বা বিষয়বস্তুর ওপর বিধিনিষেধ:** স্বাধীন সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমগুলোর অভিযোগ, গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আর্থিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে এবং বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে তাদের বিজ্ঞাপন বন্ধ রাখার জন্য চাপ দিয়ে মিডিয়া আউটলেটগুলিকে প্রভাবিত করেছিল।যেসব সংবাদমাধ্যম সরকারের সমালোচনা করেছে অথবা বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ড ও বক্তব্য প্রচার করেছে, সরকার সেসব সংবাদমাধ্যমকে চাপে রেখেছে। সেপ্টেম্বরে একদল সংবাদমাধ্যম বিশেষজ্ঞ, বেসরকারি সংগঠন (এনজিও) ও সাংবাদিক বলেন, সরকারের নিয়ন্ত্রণের কারণে আইনের শাসন ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা দুটোই নিম্নগামী। নাগরিক সমাজের দৃষ্টিতে এই প্রবণতা সমাজের ওপর সরকারের অবিশ্বাসেরই প্রতিফলন।

বেসরকারি মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলো রাজনৈতিক স্পর্শকাতর বিষয় অথবা ক্ষমতাসীন দলের সমালোচনা করা হয় এমন বিষয়ের বাইরে অন্য বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনে অনেকটাই স্বাধীন ছিল। তবে রাজনৈতিক মেরুকরণ ও সংবাদমাধ্যমের আত্মনিয়ন্ত্রণ সমস্যা রয়ে গেছে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকেরা প্রায়ই অভিযোগ করেছেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও সম্পাদক কর্তৃপক্ষ সরকার, সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার চাপের ভয়ে তাঁদের প্রতিবেদন প্রকাশ থেকে বিরত থেকেছেন। কিছু সাংবাদিক তাদের প্রতিবেদন প্রকাশের পর হুমকি পেয়েছেন।

১ ফেব্রুয়ারি আল-জাজিরার অনুসন্ধানী ইউনিট 'অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার'স মেন' শীর্ষক একটি তথ্যচিত্র প্রকাশ করে (অধ্যায় ৪ দ্রষ্টব্য)। আন্তর্জাতিকভাবে তথ্যচিত্রটি ব্যাপক আলোচিত হলেও স্থানীয় সংবাদমাধ্যম এ প্রতিবেদনটির তেমন কোনো উল্লেখ করেনি । সুপরিচিত সংবাদপত্রগুলো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ব্যাখ্যা করেছে, তারা কেন তথ্যচিত্রটিতে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে, সেগুলো নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি। দেশের সবচেয়ে নামকরা ইংরেজি দৈনিক *ডেইলি স্টার*-এর একজন সম্পাদক বলেছেন, 'আজ আমরা যদি স্বাধীন সংবাদমাধ্যম হতাম, তাহলে আল-জাজিরার প্রতিবেদনে উল্লেখিত অভিযোগগুলো গভীরভাবে খতিয়ে দেখতাম এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করে বলতে পারতাম, এতে আসলে উঁচুমানের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হয়নি।' *ঢাকা ট্রিবিউনে*র সম্পাদকীয়তে সংবাদপত্রটির নীরবতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই বলে যে, 'বাংলাদেশের মিডিয়া এবং মানহানি আইনের বর্তমান অবস্থা এবং এই আইনের বিচারিক ব্যাখ্যার কারণে বাংলাদেশের যেকোনো সংবাদমাধ্যমের জন্য ওই বিতর্ক নিয়ে অর্থপূর্ণ কোনো ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করা বোকার মতো কাজ হবে।'

দেশের প্রথম অনলাইন সংবাদমাধ্যম *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম* ক্ষমতাসীন দলের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) তার এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে মামলার পুরানো প্রতিবেদনগুলি অপসারণের দাবিতে রাজনৈতিক চাপের সম্মুখীন হয়েছিল। এক বন্ধুকে দিয়ে ওই সাবেক এমপি সংবাদমাধ্যমটির চার জ্যেষ্ঠ সম্পাদকের বিরুদ্ধে ২০০ কোটি টাকার মানহানির মামলা করানোর চেষ্টা করেন, তবে বরিশালের একটি আদালত সে আবেদন নামঞ্জুর করেছেন।

সাংবাদিক ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তথ্যমতে, নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতিশোধের ভয়ে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলার ভয়ে সাংবাদিকেরা আত্মনিয়ন্ত্রণ করেছেন। সরকারের প্রকাশ্য সমালোচনা নিয়মিত ও জোরালো হলেও কিছু সংবাদমাধ্যম ব্যক্তিত্ব সরকারের হয়রানির শঙ্কার কথা জানিয়েছেন।

**মানহানি আইন:** নিন্দা, অপবাদ, মানহানি ও ধর্মীয় অবমাননাকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এগুলোর বেশিরভাগই সরকার, প্রধানমন্ত্রী বা সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কথা বলা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। বিরোধী পক্ষ ও সুশীল  সমাজের সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলায় মানহানির আইন ব্যবহার হয়েছে।

২০ এপ্রিল সংবাদমাধ্যম জানায়, সম্প্রচারমাধ্যম *এনটিভি, খুলনা গেজেট* ও *দৈনিক লোকসমাজ* পত্রিকার ব্যুরো চিফ আবু তায়েবকে খুলনা সিটির মেয়র তালুকদার খালেকের দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মেয়র তাঁর মামলায় অভিযোগ করেছেন, আবু তায়েব ফেসবুকে ভুয়া তথ্য ছড়িয়েছেন, যার কারণে তাঁর মানহানি হয়েছে। ২২ এপ্রিল ও ২৮ এপ্রিল খুলনার একটি আদালত আবু তায়েবের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠান। কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টস জানিয়েছে, তায়েব খুলনার স্থানীয় ঘটনাবলী ও দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে রিপোর্ট করতেন। ১২ মে তিনি জামিনে মুক্ত হলেও মামলাটি রয়ে গেছে।

২৫ এপ্রিল রংপুর সিটির মেয়র মোমিনুর রহমান সরকারের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেন। এতে তিনি মোমিনুরের বিরুদ্ধে তাঁকে নিয়ে মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর অভিযোগ করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মোমিনুর একটি সংবাদ শেয়ার করেছিলেন, যেখানে মেয়রের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করা হয়েছে। মোমিনুর শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, ফেসবুক পোস্টের কারণে তিনি গ্রেপ্তার হতে পারেন।

২৬ এপ্রিল যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন আর্টিকেল ১৯ এক বিবৃতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ব্যাপক হারে মামলা ও সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। সংগঠনটির মতে, সিংহভাগ মামলা হয়েছে ক্ষমতাসীন দলের তরফ থেকে এবং 'মহামারিকালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার উদ্বেগজনক পর্যায়ে বেড়েছে'।

**জাতীয় নিরাপত্তা:** কর্তৃপক্ষ বলেছে, জাতীয় ও সাইবার নিরাপত্তার জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন জরুরি। তবে  সরকারের সমালোচকদের গ্রেপ্তার বা সাজা দিতে অথবা সরকারি নীতি বা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা ঠেকাতে এই আইনের ব্যবহার করা হয়েছে।

**বেসরকারি প্রভাব**: বেসরকারি, সামাজিক চাপেও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত হয়েছে। নাস্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ, ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং এলজিবিটিকিউআই+লেখক ও ব্লগারেরা অভিযোগ করেছেন, চরমপন্থী সংগঠনগুলোর তরফ থেকে তাদের হত্যার হুমকি দেওয়া অব্যাহত ছিল।

## ইন্টারনেট স্বাধীনতা

সরকার অবাধ ইন্টারনেট ব্যবহারে বাধা দিয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ঘটনায় অনলাইন কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ করেছে। আইনের মাধ্যমে ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্কও ভয়েস-ওভার-ইন্টারনেট-প্রটোকল (ভিওআইপি) টেলিফোন নিষিদ্ধ করা আছে। তবে কর্তৃপক্ষ এই বিধিনিষেধ খুব কমই প্রয়োগ করেছে। সরকার যথাযথ আইনি কর্তৃত্ব ছাড়াই ব্যক্তিগত অনলাইন যোগাযোগে নজরদারি করেছে।

বেশ কয়েকটি ঘটনায় সরকার ইন্টারনেট যোগাযোগে হস্তক্ষেপ করেছে, ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করেছে, কন্টেন্ট নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং ওয়েবসাইট বা অন্যান্য যোগাযোগ ও ইন্টারনেট সেবা নিয়ন্ত্রণ করেছে। সরকার অস্পষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে অথবা বিরোধী দলীয় কন্টেন্ট আইন ভঙ্গ করার অপরাধে অনেক ওয়েবসাইট স্থগিত বা বন্ধ করে দিয়েছে।

টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি)। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও সরকারের অনুরোধে বিটিআরসি কন্টেন্ট ব্লক করতে ইন্টারনেট সেবাদাতাদের নির্দেশ দিয়ে থাকে। সরকার যেসব কন্টেন্টকে 'জাতীয় ঐক্য ও ধর্মীয় অনুভূতির' জন্য ক্ষতিকর বলে অভিহিত করেছে, সেগুলো বিটিআরসি অপসারণ করেছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ইসরায়েলের তৈরি নজরদারি অ্যাপ্লিকেশন ‘পেগাসাস’ ব্যবহারকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। সরকারের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রী এই সফটওয়্যার কেনার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসংস্থাগুলো এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে বলে জানিয়েছেন। তবে সিটিজেন ল্যাব নামের একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান দাবি করেছে, তারা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় টেলিযোগাযোগ কোম্পানি বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেডের (বিটিসিএল) নেটওয়ার্কে ওই সফটওয়্যারটি শনাক্ত করেছে।

সরকারের এক মন্ত্রীর দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের পর জানুয়ারিতে কর্তৃপক্ষ সুইডেনভিত্তিক ওয়েবসাইট নেত্রনিউজ বন্ধ করে দেয়।

২৬ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত দেশজুড়ে থ্রি-জি ও ফোর-জি ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। দেশের ব্যবহারকারীরা এ কয়দিন ফেসবুক বা ফেসবুক মেসেঞ্জার অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেননি। ২৭ মার্চ ফেসবুক জানায়, ‘বাংলাদেশে আমাদের সেবা বন্ধ থাকার বিষয়টি আমরা অবগত হয়েছি। বিষয়টি আরও ভালো করে বুঝতে আমরা কাজ করছি এবং আশা করছি, আমাদের সেবা যত দ্রুত সম্ভব আবার চালু হবে।’ বিটিআরসি বলেছিল, ‘কারিগরি ত্রুটির’ কারণে সেবা বন্ধ হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সেবা বন্ধের কথা অস্বীকার করে বলেছে, জাতীয় নিরাপত্তাজনিত কারণে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এই পদক্ষেপ নিয়েছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে আভাস পাওয়া গেছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের প্রতিবাদে দেশজুড়ে হওয়া বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে ওই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল (অধ্যায় ১.ক, ১.খ, ১.ঘ, ২.খ ও ৬ দ্রষ্টব্য)।

জাতিসংঘের ২০২০ সালের এপ্রিলের একটি ফাঁস হওয়া নথির ভিত্তিতে প্রতিবেদন করার পর এপ্রিলে বিটিআরসি রেডিও ফ্রি এশিয়ার সহযোগী সংবাদমাধ্যম ব্যানারনিউজ বন্ধ করে দেয়। ওই প্রতিবেদনের ভাষ্য, জাতিসংঘের ওই নথিতে সতর্ক করে বলা হয়েছিল, সরকারের যথাযথ পদক্ষেপের ঘাটতির কারণে কোভিড-১৯-এ ২০ লাখ মানুষের মৃত্যু হতে পারে। মে মাসে বেনারনিউজের ওয়েবসাইট আংশিক খুলে দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রীকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ‘শিকারী’ বলে অভিযোগ করে ৫ জুলাই একটি প্রতিবেদন প্রকাশের পর বাংলাদেশে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের সাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

অক্টোবরে দুর্গাপূজার সময় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর সহিংসতার ঘটনায় (অধ্যায় ১.ঘ ও ৬ দ্রষ্টব্য) সরকারি কর্তৃপক্ষ গুজব ও সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ঢোকার সুযোগ সীমিত করে দেয় ও  ইন্টারনেটের গতি ধীর করে দেওয়া হয়।

## শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে স্বাধীনতা

শিক্ষা বা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের স্বাধীনতায় সরকার খুব বেশি বিধিনিষেধ আরোপ না করলেও কর্তৃপক্ষ ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে এমন স্পর্শকাতর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে গবেষণা নিরুৎসাহিত করেছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে একাডেমিক  গবেষণা নিবন্ধও নিবিড় যাচাই ও সরকারি অনুমোদনের পরই প্রকাশ করতে হয়েছে।

অক্টোবরে বাংলাদেশ সাইবার ট্রাইব্যুনাল আনুষ্ঠানিকভাবে বাউলশিল্পী রিতা দেওয়ানের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ গঠন করে। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে এক আইনজীবী অভিযোগ করেন, রিতা দেওয়ান একটি সংগীত প্রতিযোগিতায় আল্লাহকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন। একই মাসে রিতা দেওয়ানের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ফৌজদারি মামলা হয় এবং ২০২০ সালের ডিসেম্বরে একটি আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। জানুয়ারিতে জামিন পাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি আটক ছিলেন।

## খ. শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতা

সরকার শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতা সীমিত করেছে।

## শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার স্বাধীনতা

আইনে শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সরকার এই অধিকার সীমিত করেছে। আইন সরকারকে নিজ বিবেচনার ভিত্তিতে একসঙ্গে চারজনের বেশি মানুষের জমায়েত নিষিদ্ধ করার ব্যাপক অনুমতি দিয়েছে। বিক্ষোভ বা প্রতিবাদের জন্য আয়োজিত কোনো ধরনের সমাবেশ করার আগে সরকারের অনুমতি নিতে হয় (দেখুন সেকশন ১. ৫)।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে কর্তৃপক্ষ সমাবেশ নিষিদ্ধ করার ধারাগুলো বিরোধীদলগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা অব্যাহত রেখেছে। পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন সরকার অনুমতির জন্য অযৌক্তিক শর্ত জারি করেছে। মাঝে মাঝে পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা বিরোধী দল, সংগঠন বা অ্যাকটিভিস্টদের বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করে দিতে শক্তি প্রয়োগ করেছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরকে কেন্দ্র করে হেফাজতে ইসলাম (অধ্যায় ১. ক, ১. খ, ১. ঘ, ২.ক, এবং ৬ দ্রষ্টব্য) ২৬ থেকে ২৮ মার্চ বিক্ষোভের ডাক দেয়। পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, ওই বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হয়েছিল। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছার পর তা সহিংস হয়ে ওঠে। পরে পুলিশ ১৫৪টি মামলা করে, যেখানে ৩,২৭০ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। অজ্ঞাত পরিচয় আসামি উল্লেখ করা হয় অসংখ্য, যার ফলে যে কাউকেই এই মামলার আসামি হিসেবে দেখানোর সুযোগ তৈরি হয়। মামলায় বিরোধী দল ও হেফাজতে ইসলামের ১,২৩০ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশ ছাত্র, যুব ও শ্রমিক অধিকার পরিষদের ৫৩ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

বছরজুড়েই বিরোধীদলের নেতা, কর্মী ও সংগঠনগুলোকে সভা-সমাবেশের বিষয়ে অসংখ্য বাধানিষেধের মুখে পড়তে হয়। বিএনপিকে নিয়মিতভাবেই সভা, সমাবেশ বা বিক্ষোভ করতে বাধা দেওয়া হয় বা তাদের অনুষ্ঠানে গিয়ে কর্তৃপক্ষ কিংবা ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা ভীতি প্রদর্শন করে। ২৯ মার্চ খুলনায় বিএনপির অফিসের সামনে আয়োজিত কর্মসূচিতে পুলিশের হামলার অভিযোগ ওঠে। এতে ২০ জন আহত হয়। ৩১ মে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দরিদ্রদের মধ্যে খাবার বিতরণসহ বিএনপির বিভিন্ন কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে।

## সংগঠন করার স্বাধীনতা

আইনে নৈতিকতা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনা সাপেক্ষে 'যুক্তিসংগত বিধিনিষেধের' ব্যতিক্রম ছাড়া দেশের নাগরিকদের সংগঠন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। সরকার সাধারণভাবে এই অধিকারের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। সরকারের এনজিওবিষয়ক ব্যুরো অনেক সময় তাদের কাছে স্পর্শকাতর বলে বিবেচিত বিভিন্ন ইস্যুতে কাজ করা এনজিওগুলোর বিদেশি তহবিল স্থগিত বা সময়ক্ষেপণ করেছে। স্পর্শকাতর বলে বিবেচিত বিষয়গুলোর উদাহরণের মধ্যে রয়েছে মানবাধিকার, শ্রমিক অধিকার, আদিবাসীদের অধিকার কিংবা রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কর্মসূচির মতো ইস্যু (দেখুন ২.ঘ; ৫ এবং ৭.ক)।

আইন এনজিও বা সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশি তহবিল নেওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে । এছাড়া সংবিধান বা সাংবিধানিক কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করলে এনজিওর বিরুদ্ধে শাস্তির কথা বলা হয়েছে (দেখুন অধ্যায় ৫)।

## গ. ধর্মীয় স্বাধীনতা

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক রিপোর্ট দেখুন:

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.

## ঘ. স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও দেশের বাইরে যাওয়ার অধিকার

আইনে দেশের ভেতরে মুক্তভাবে চলাচল, অভ্যন্তরীণ অভিবাসন এবং প্রত্যাবাসনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তিনটি স্পর্শকাতর এলাকা-- পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবির এবং বঙ্গোপসাগরের ভাসান চর দ্বীপ -- বাদে সরকার এই অধিকারকে সাধারণভাবে সম্মান করেছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশিদের প্রবেশ এবং (ক্যাম্পে) রোহিঙ্গাদের চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ দিয়েছে। কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শিবিরের চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া আছে। পায়ে হেঁটে বিভিন্ন ক্যাম্পের মধ্যে বা বাইরের জনপদে চলাচলের জন্য সামান্য কয়েকটি গেট রয়েছে। মার্চ মাসে কিছু ক্যাম্পে বড় অগ্নিকাণ্ডের সময় পর্যাপ্ত সংখ্যক পথচারী গেটের অভাব প্রস্থান বাধাগ্রস্ত করেছিল। ভাসানচর এমন একটি দ্বীপ, যার সঙ্গে বাংলাদেশের মূল ভূ-খণ্ডের নিয়মিত যোগাযোগ নেই। আগস্টে ভাসানচর থেকে পালিয়ে মূল ভূ-খণ্ডে যাওয়ার চেষ্টা করে পানিতে ডুবে মারা যায় ১১ রোহিঙ্গা। জানুয়ারিতে কক্সবাজারের শিবির থেকে ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তর শুরু হওয়ার পর থেকে শত শত রোহিঙ্গা পালানোর চেষ্টা করেছে। ভাসানচর থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টার সময়ে কর্তৃপক্ষ অনেক রোহিঙ্গাকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের মূল-ভূখণ্ডে আটক রাখা হয় কিংবা ভাসানচরে ফেরত পাঠানো হয়।

বিদেশ ভ্রমণের  অনুমতি থাকলেও সুশীল সমাজের জ্যেষ্ঠ কিছু প্রতিনিধি ও কিছু আন্তর্জাতিক এনজিওর প্রতিনিধি ভিসা সংগ্রহের সময়, দেশত্যাগ বা দেশে প্রবেশের সময় বিমানবন্দরে সময়ক্ষেপণ হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। সরকার ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ের সন্দেহভাজন যুদ্ধাপরাধীদের দেশত্যাগে বাধা দিয়েছে।

বছরজুড়ে করোনার বিস্তার ঠেকাতে অনেকবার লকডাউনসহ চলাচলে বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। করোনার বিধিনিষেধ সব নাগরিকের জন্যই প্রযোজ্য থাকলেও সুশীল সমাজের অভিযোগ, কোয়ারেন্টিনসহ বিভিন্ন বিধি ভাঙার জন্য দরিদ্র মানুষ তুলনামূলকভাবে বেশি শাস্তি পেয়েছে বা আটক হয়েছে। করোনায় চলাফেরার বিধিনিষেধ ও জরিমানা এড়ানোর জন্য ঘুষ দেওয়ার কথাও শোনা গেছে।

## ঙ. অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুতদের অবস্থা ও তাদের প্রতি ব্যবহার

১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সশস্ত্র লড়াইয়ের কারণে গৃহীত সরকারি নীতির জেরে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আদিবাসীদের প্রান্তিকীকরণ ও সামাজিক অস্থিরতা বজায় রয়েছে। ওই নীতির আওতায় ভূমিহীন বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানান্তর করা হয়। এর অলিখিত উদ্দেশ্য ছিল জনসংখ্যার ভারসাম্য পরিবর্তন ঘটিয়ে সেখানে বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করে তোলা। এতে করে হাজার হাজার আদিবাসী বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে।

অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের নিরাপত্তা সীমিত। কমিউনিটি নেতারা বলেছেন, সেটলার (বসতি স্থাপনকারী) বাঙালিদের হাতে আদিবাসীরা ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন। অনেক সময় নিরাপত্তা বাহিনী এতে সমর্থন দিয়েছে।(দেখুন অধ্যায় ৬)

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস্তুচ্যুত আদিবাসীদের সংখ্যা এখনো বিতর্কিত। ২০০০ সালে একটি সরকারি টাস্কফোর্সের হিসাবমতে এই সংখ্যা পাঁচ লাখ, যেখানে আদিবাসী ও অ-আদিবাসী উভয়েই আছে। ২০২০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের হিসাব মতে ওই এলাকায় ৯০ হাজারের কিছু বেশি বাস্তুচ্যুত আদিবাসীর বসবাস। প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য এলাকার বিদ্যমান ভূমি সমস্যার নিরসন করে বাস্তুচ্যুতদের ঘরে ফেরায় সহায়তা করা ও সামরিক বাহিনীর ক্যাম্পগুলো বন্ধের অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু সেটলার বাঙালিদের উদ্বাস্তু হিসেবে উল্লেখ করা নিয়ে বিতর্কের কারণে টাস্কফোর্স কাজ করতে পারছে না। কমিশন বলেছে, বিজিবির শিবির ও সেনাবাহিনীর বিনোদনের স্থাপনা নির্মাণের জন্য সেখানে কিছু আদিবাসী পরিবারকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে। এ বছর কোনো ভূমি বিরোধের সমাধান হয়নি।

## চ. শরণার্থীদের সুরক্ষা

সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সুরক্ষা ও সহায়তায় জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনকে সহযোগিতা করেছে ।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৬৭ সালের প্রটোকল কিংবা ১৯৫১ সালের শরণার্থীদের মর্যাদাবিষয়ক সনদের স্বাক্ষরকারী নয়। এ কারণে সরকার দাবি করে, এই সনদ বা প্রটোকলে উল্লেখিত শরণার্থীদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি মেনে চলার আইনি বাধ্যবাধকতা তাদের নেই।

২০১৭ সালের রোহিঙ্গা ঢলের আগে সরকার ও ইউএনএইচসিআর কুতুপালং ও নয়াপাড়া শিবিরে থাকা ৩৩,০০০ নিবন্ধিত রোহিঙ্গাকে সাময়িক সুরক্ষা ও মৌলিক সহায়তা দেয়। এর বাইরে সরকার ও আন্তর্জাতিক অভিবাসনবিষয়ক

সংস্থা (আইওএম) কক্সবাজারের বিভিন্ন অস্থায়ী শিবিরে বসবাসকারী প্রায় দুই লাখ অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাকে সহায়তা দেয়। ২০১৭ সালে সাড়ে ৭ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা বার্মায় (মিয়ানমার) জাতিগত নিধনের শিকার হয়ে পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় বাংলাদেশে ঢোকে। ফলে সব মিলিয়ে শরণার্থী শিবির, অস্থায়ী আবাসন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে বসবাসকারী রোহিঙ্গার সংখ্যা হয় ৯ লাখ ৭ হাজারের বেশি। সরকারের দাবি, সব মিলিয়ে এই সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ সরকার এই রোহিঙ্গাদের শরণার্থী বলে স্বীকৃতি দেয়নি। সরকার মনে করে রোহিঙ্গারা 'জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত' বার্মার নাগরিক। কিন্তু জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক অনেক বিধি মেনে চলেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ব্যতিক্রম হলো, সরকার রোহিঙ্গাদের সারাদেশে মুক্তভাবে চলাচলের স্বাধীনতা দেয়নি। সরকারি কর্মকর্তারা বলেন তাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, চলাচলের স্বাধীনতা বা জীবিকার সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব নয়।

২৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে রোহিঙ্গাদের সামগ্রিক সহায়তায় তদারকি ও কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের সহায়তায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সমন্বয় করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন রোহিঙ্গাদের স্থানীয় পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভাসানচরে ১৭ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী স্থানান্তর করা হয়। বছরের মাঝামাঝি সময়টাতে সরকার কয়েক মাসের জন্য এই স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় বিরতি দিয়েছিল। নভেম্বরের শেষে আবারও রোহিঙ্গাদের কক্সবাজার থেকে ভাসানচরে পাঠানো শুরু হয়। সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, সরকার সব মিলিয়ে এক লাখ রোহিঙ্গাকে ভাসানচরে নেওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে ২,৫৮০ কোটি টাকার বেশি ব্যয় করেছে। সরকার রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে না পাঠিয়ে মূল ভূখণ্ডে রাখতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের অনুরোধ মানেনি। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জনাকীর্ণ কক্সবাজারের শিবিরগুলোর চেয়ে ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের জীবনমান উন্নত হবে। মার্চে সরকার জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভাসানচর পরিদর্শনের অনুমতি দেয়। সঙ্গে ছিল। ৯ অক্টোবর কর্তৃপক্ষ ইউএনএইচসিআরের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে যা ভাসানচরে জাতিসংঘের সম্ভাব্য কার্যক্রমের মানবিক ও সুরক্ষা কাঠামোর রূপরেখা দেয়। এবছর জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ভাসানচরের বিষয়ে নানা

ধরনের মূল্যায়ন করে এবং সরকারের সঙ্গে সেখানে কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতি নিয়ে কাজ করে।

২৯ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারে বন্দুকধারীরা গুলি করে আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইট ফর পিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটসের চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ মহিব উল্লাহকে হত্যা করে। গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, অপরাধী চক্রগুলো এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। মহিব উল্লাহ রোহিঙ্গাদের অধিকার  নিয়ে সোচ্চার ছিলেন। এ কারণে তাকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা হয়। মহিব উল্লাহ রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার  নিয়ে সোচ্চার ছিলেন। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে বার্মার নিরাপত্তাবাহিনীর অপরাধ নথিবদ্ধ করার কাজ করেছিলেন তিনি। আন্তর্জাতিক ফোরামেও রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার নিয়ে কথা বলেছিলেন মহিব উল্লাহ। ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ খুনিদের নাম বা হত্যার উদ্দেশ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করতে পারেনি।

**আশ্রয়ের অধিকারঃ**দেশের আইনে আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দেওয়া বা শরণার্থী মর্যাদা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। সরকার শরণার্থীদের সুরক্ষার জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া গড়ে তোলেনি। তবে সরকার এদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উল্লেখযোগ্য সুরক্ষা ও সহায়তা দিচ্ছে। ২০১৭ সালের আগে সরকার ইউএনএইচসিআর এর সঙ্গে মিলে দুটি আনুষ্ঠানিক শিবিরে রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা ও সহায়তা দেয়। ২০১৭ সালে সাড়ে ৭ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে ঢোকার পর সরকার বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে তাদের নিবন্ধন করা শুরু করে ও বার্মার ঠিকানা অনুযায়ী পরিচয়পত্র দেয়। ২০১৯ সালে সরকার ইউএনএইচসিআরের সঙ্গে যৌথভাবে রোহিঙ্গাদের শনাক্ত করা ও নতুন পরিচয়পত্র দেওয়ার মাধ্যমে দ্বিতীয় ধাপের নিবন্ধন প্রক্রিয়া শেষ করে। রোহিঙ্গাদের বার্মায় জোর করে ফেরত পাঠানোর বিপক্ষে সরকারের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এসব সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই নথিভুক্তির ব্যবস্থা সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিকভাবে শরণার্থীর মর্যাদা না দেওয়ায় এবং শিবিরগুলোতে স্পষ্ট আইনি প্রক্রিয়া না থাকায় ন্যায়বিচার ব্যবস্থার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে রোহিঙ্গারা।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ১১ই ফেব্রুয়ারি ৯০ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে নিয়ে একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা কক্সবাজার থেকে মালয়েশিয়ার দিকে যাত্রা শুরু করে। যাত্রীদের মধ্যে নারী এবং শিশুই ছিল বেশি। যাত্রার চারদিন পর আন্দামান সাগরে গিয়ে নৌকার ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায় । নয়জন শরণার্থী মারা যায়। ১১৩ দিনের দীর্ঘ যাত্রা শেষে বেঁচে থাকা ৮১ জন ইন্দোনেশিয়ার একটি দ্বীপে গিয়ে পৌঁছায়। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বিভিন্ন

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এবং নৌকায় থাকা যাত্রীদের পরিবারের সদস্যরা তাদের ব্যাপারে তথ্য চেয়ে ভারত, বাংলাদেশ, বার্মা (মিয়ানমার ) ও মালয়েশিয়া সরকারের কাছে আবেদন করে। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, বাংলাদেশ সরকার এই ৮১ জন শরণার্থীকে আবার দেশে ঢুকতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

**অভিবাসী ও শরণার্থীদের নিগ্রহ:** রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সুরক্ষা এবং সহায়তামূলক কাজে বাংলাদেশ সরকার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা–ইউএনএইচসিআর এবং অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে সহযোগিতা করেছে। তবে মানবিক সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোভিড–১৯ চলাকালীন প্রতিবন্ধকতাগুলো আগস্ট মাসে উঠে যাওয়ার পর শরণার্থী শিবিরগুলোতে নিরাপত্তা একটা বড় শঙ্কার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কয়েকটি হাই-প্রোফাইল হত্যাকাণ্ডের পর নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়। শিবিরগুলোতে কাজ করা এনজিওগুলো বলছে, সেখানে প্রায়শই মানবপাচার ঘটে থাকে। এসব ঘটনার মধ্যে সামান্যই রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থায় আওতায় আসে । উদ্ধার হওয়ার পরে সরকারি কর্মকর্তারা পাচারের শিকার ব্যক্তিদের শিবিরে ফেরত পাঠান।

আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, শিবিরগুলোতে নারীর বিরুদ্ধে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা ঘটে থাকে। এর মধ্যে ৯০ শতাংশ ঘটনাই ঘটে থাকে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। কোভিড-১৯ মহামারিকালে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাজ সীমিত হয়ে পড়ার ফলে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঘটনাগুলো কম উঠে এসেছে এবং এগুলোর পর্যবেক্ষণও কম হয়েছে।

মানব পাচারসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কাজের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা একটা বড় সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। শিবিরগুলোতে অপরাধের অভিযোগের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গারা স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের (তাদের ক্যাম্প ইনচার্জ বা সিআইসি বলা হয়) ওপর নির্ভর করে। সিআইসিরা মূলত স্বতন্ত্র এবং দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী, কিছু সিআইসির মধ্যে দুর্নীতির প্রবণতা রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অভিযোগ, কিছুসংখ্যক সীমান্তরক্ষী, সেনাবাহিনী ও পুলিশ কর্মকর্তা রোহিঙ্গা নারী ও শিশু পাচারে জড়িত। তারা দেখেও না দেখার ভান করা থেকে শুরু করে টাকার বিনিময়ে পাচারকারীদের শিবিরে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া, এমনকী নিজেরা সরাসরি পাচার কাজে লিপ্ত হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন মাত্রায় এতে যুক্ত।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এক প্রতিবেদনে জানায়, ৬ এপ্রিল ভাসানচর থেকে পালানোর চেষ্টার অভিযোগে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ১২ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে ধরে ফেলে এবং মারধর করে। ১২ এপ্রিল উপকূলরক্ষী বাহিনীর এক সদস্য নিজেদের এলাকা ছেড়ে ক্যাম্পের অন্য প্রান্তে গিয়ে খেলার জন্য চার রোহিঙ্গা শিশুকে প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে পেটান বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণের ভিত্তিতে জানায়, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ভাসানচর থানায় শরণার্থীদের মারধর করেছে।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ৩ জুন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা বিক্ষোভকারী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের লাঠিপেটা করে বলে অভিযোগ করা হয়। ভাসানচরে জাতিসংঘের একটি উচ্চ পর্যায়ের সফরের সময় ইউএনএইচসিআরের কর্মকর্তাদের কাছে যেতে না দেওয়ার প্রতিবাদে তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে জানা যায়, দুজন শরণার্থী ইউএনএইচসিআরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তাদের বাধা দেওয়া হয়। ইউএনএইচসিআর শরণার্থীদের আহত হওয়ার ঘটনা এবং বিনা বিচারে গ্রেপ্তার, আটক এবং চলাফেরার স্বাধীনতা না থাকার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ৭ জুন 'অ্যান আইল্যান্ড জেইল ইন দ্য মিডল অব দ্য সি' (সাগরের মাঝে দ্বীপ–কারাগার) শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। রিপোর্টে সংগঠনটি অভিযোগ করে, সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থী ও আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠীকে ভাসান চরের অবস্থার ব্যাপারে বিভ্রান্ত করেছেকিছু শরণার্থী তাদেরকে ভালোভাবে না জানিয়ে বুঝিয়ে জোর করে ভাসান চরে পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ করে। প্রতিবেদনের জন্য সাক্ষাত্কার নেওয়া অন্যান্য রোহিঙ্গা শরণার্থীরা সম্মত হন যে, ভাসান চরের আশ্রয় কেন্দ্র কক্সবাজারের শিবিরগুলোর চাইতে ভালো এবং সেখানে খোলা জায়গাও অপেক্ষাকৃত বেশি। তবে তারা জানায় সেখানে খাবার সংকট আছে, স্বাস্থ্য পরিসেবা অপর্যাপ্ত, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সীমিত, চলাফেরার স্বাধীনতায় বিধি নিষেধ আছে এবং জীবিকার সুযোগ অপর্যাপ্ত। কিছু শরণার্থী অভিযোগ করেছে যে তাদের আত্মীয়দের নির্বিচারে আটক করা হয়েছে এবং দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করার জন্য মারধর করা হয়েছে। কেউ কেউ তাদের কম্পাউন্ডের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করার জন্য মারধর করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ এসব অভিযোগের তদন্ত করেনি। স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলি দ্বীপের দূরবর্তী অবস্থানের কারণে উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের কাছে পৌছুতে অসুবিধার কথা জানিয়েছে।

১৪ আগস্ট ৪০ থেকে ৪৫ জন রোহিঙ্গাকে নিয়ে ভাসানচর থেকে পালিয়ে যাওয়ার পথে একটি নৌকা ডুবে যায়। এদের মধ্যে নারী এবং শিশুরাও ছিল। কর্তৃপক্ষ ২৫ জনকে উদ্ধার করে। কিন্তু নৌকা ডুবে ১১ জন মারা যায়। ১৫ জনের কোন হদিস পাওয়া যায়নি। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, শরণার্থীরা দাবি করেছে কাজের অভাব এবং শিবিরে ফেলে আসা আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার সুযোগ না থাকায়ই ঝুঁকিপূর্ণ পথে তাদের পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা বেড়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ ও সরকারের মধ্যে সমঝোতা স্মারকে ভাসানচরে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সুরক্ষা ও সেবা উন্নত করার বিধান রয়েছে।সমঝোতা স্মারক অনুসারে শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ, জীবিকা, স্বাস্থ্য এবং নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবার মতো সুবিধাগুলো সম্প্রসারণ করার কথা। ২০২২ সালের জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এতে অর্থায়ন করা যেতে পারে।

**চলাফেরার স্বাধীনতা:** রোহিঙ্গাদের চলাফেরার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ বজায় ছিল। বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনএইচসিআরের মধ্যে স্বাক্ষরিত ১৯৯৩ সালের সমঝোতা স্মারক অনুসারে নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থীরা শিবিরের বাইরে যেতে পারেন না।

২০১৭ সালের ব্যাপক রোহিঙ্গা ঢলের পর নিবন্ধিত এবং নতুন আগমনকারী রোহিঙ্গা উভয়ের উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার বাইরে যাওয়া ঠেকাতে পুলিশ রাস্তায় চেকপোস্ট স্থাপন করে। এখন যেসব রোহিঙ্গা ভাসানচরে আছেন তাদের এই দ্বীপ ছেড়ে বের হওয়ার বা কক্সবাজারের শিবিরের যাওয়ার উপায় নেই বললেই চলে। অনেকেরই দাবি, শিবিরে তাদের পরিবারের সদস্য রয়েছে। এ কারণে কিছু মানবাধিকার সংগঠন ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের এই প্রত্যাবাসনকে এক ধরনের বন্দিজীবন বলে আখ্যায়িত করে। এ পর্যন্ত অন্তত ২০০ শরণার্থীকে এই দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কক্সবাজারের বালুখালীতে ২২ মার্চ রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে আগুন লেগে ১৫ জন শরণার্থী মারা যায়। ইউএনএইচসিআর-এর হিসাব অনুযায়ী, অন্তত সাড়ে ৫০০ শরণার্থী এতে আহত হয় এবং ৪৮ হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় দমকল বাহিনী এবং উদ্ধারকর্মীরা এগিয়ে আসে। তবে এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, শিবিরের মধ্য দিয়ে এবং চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া থাকায় শরণার্থীরা আগুন লাগার পর দ্রুত দ্রুত এলাকা ছাড়তে পারেনি এবং উদ্ধারকর্মীরাও ঠিকমতো সে শিবিরে পৌঁছাতে পারেনি। *ইউএন নিউজ* এর প্রতিবেদন অনুযায়ী কক্সবাজারের শরণার্থী

শিবিরগুলোতে ঘন ঘন আগুন লাগার ঘটনা শরণার্থীদের বিপর্যস্ত করে ফেলেছে।

ভাসান চরের ৬৮ জন রোহিঙ্গাকে ডিসেম্বর মাসে তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার জন্য মূল ভূখণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্যোগ মন্ত্রণালয় একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান এভাবে সরকার প্রতি মাসে অন্তত দুটো দলকে দ্বীপ থেকে কক্সবাজারের শিবিরে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।

সরকার ২০১৯ সালে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ এবং এর চারপাশে বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করে। এর কারণ হিসেবে উন্নততর নিরাপত্তা এবং রোহিঙ্গাদের পাচারের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যমাত্রার কথা বলা  হয়। তবে মানবিক সংস্থাগুলি উদ্বেগ প্রকাশ করে যে বেড়া দেওয়া হলে শরণার্থীদের পরিষেবা সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হবে  এবং উদ্বাস্তু ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে।

অনেক রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের কর্তৃপক্ষ আইন শৃঙ্খলাবজায় রাখতে বিশেষ করে রাতে কারফিউ ও টহল পরিচালনা করে। সহিংস হামলা, অপহরণ কিংবা জোর করে ধরে নেওয়ার মত অপরাধ নিয়ে কথিত উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে এইসব উদ্যোগ নেওয়া হয়।

**কর্মসংস্থান:** সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্থানীয়ভাবে কাজ করার অনুমোদন দেয়নি। তবে রোহিঙ্গা শিবিরগুলোর ভেতরে তাদের সীমিত পরিসরে নগদ অর্থের বিনিময়ে কিছু কাজ করতে দেওয়া হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয় (আরআরআরসি) একটি চিঠিতে কক্সবাজারে জাতিসংঘের সাব অফিসগুলোর প্রধানদেরকে স্যানিটেশন এবং রাত্রিকালীন অভিভাবকত্ব ব্যতীত সব সেক্টরে কাজের জন্য রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করার অনুরোধ জানায়। এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সিআইসি (ক্যাম্প ইনচার্জ) এনজিওগুলোর চাহিদা মূল্যায়ন অনুমোদন বা প্রকল্পের কাজ শেষে সমাপনী সনদ দিতে অস্বীকৃতি বা দেরি করেন বলে জানা গেছে। এতে কিছু এনজিওর কাজ মাঝপথে থেমে যায় এবং নতুন প্রকল্পের কাজে বাধার সৃষ্টি হয়। চলাচলের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ সত্ত্বেও কিছু শরণার্থী অবৈধভাবে স্থানীয় অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করে। এতে করে কেউ কেউ শ্রম পাচারকারী চক্রের শিকার হয়েছে ।

**মৌলিক সেবার সুযোগ:** দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোহিঙ্গা শিবিরের ভেতরে-বাইরে ও  অস্থায়ী বসতিতে সেবার প্রাপ্যতার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। রোহিঙ্গাদের সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বহু প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার কার্যক্রমের সমন্বয়

করে জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীন ইন্টারসেক্টর কোঅর্ডিনেশন গ্রুপ (আইএসসিজি)। দাতা সংস্থাগুলোর দাবি সনদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জটিলতা এবং অস্পষ্টতা মানবিক সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে। আইএসসিজির তথ্য অনুসারে, শরণার্থীরা যেসব ঘিঞ্জি এলাকায়  বাস করে তা বর্ষার বৃষ্টিপাত এবং ঘূর্ণিঝড় ঠেকাতে যথেষ্ট উপযোগী নয়। যদিও এজেন্সিগুলি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের স্থানান্তর করার জন্য উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা নিয়েছে, তবে জমির স্বল্পতা একটি কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসাবে রয়ে গেছে যা রোহিঙ্গাদের মৌলিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করে।

শিক্ষা এখনো একটি সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। সরকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিষিদ্ধ করার নীতি অব্যাহত রাখলেও রোহিঙ্গা শিশুদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার অনুমতি দেয়। ইউনিসেফ শিক্ষাখাতে নেতৃত্ব দিয়ে ক্যাম্পে শিক্ষা সহায়তা দেওয়া মানবিক সহায়তা সংগঠনগুলোকে গাইড করার জন্য বিশদ একটি শিক্ষা পদ্ধতি তৈরির করে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে হচ্ছে ইউনিসেফের তৈরি একটি শিক্ষা কার্যক্রমের ভিত্তিতে যা সরকার অনুমোদিত। তবে ওই শিক্ষার্থীরা যে একটি নির্দিষ্ট স্তরের দক্ষতা অর্জন করেছে সরকার সে মর্মে স্বীকৃতি দেয় না। বার্মিজ জাতীয় পাঠ্যক্রম ব্যবহার করে শিক্ষা প্রদানের জন্য ২০২০ সালে চালু করা শিক্ষা খাতের পাইলট কর্মসূচির বাস্তবায়ন বছরের শেষ নাগাদ ১০,০০০ রোহিঙ্গা শরণার্থী শিশুদের জন্য শুরু হওয়ার কথা ছিল। কোভিড–১৯ এর কারণে শরণার্থী পাঠদান কেন্দ্রগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এ প্রক্রিয়া আগে থমকে গিয়েছিল।

সরকার কোভিড মহামারিকালে রোহিঙ্গা শিক্ষার্থীদের জন্য দূরশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ করতে দেয়নি। ২২ সেপ্টেম্বর আরআরআরসি রোহিঙ্গা শিবিরের পাঠদান কেন্দ্রগুলো দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শ্রেণির জন্য খুলে দেওয়ার অনুমোদন দেয়। ডিসেম্বর মাসে প্রথম শ্রেণিও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সরকার নিবন্ধিত এবং অনিবন্ধিত রোহিঙ্গার জন্য জনস্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সুযোগ দিয়েছে। তবে শিবির থেকে বের হতে গেলে তাদের কর্তৃপক্ষের অনুমতির দরকার হয়। মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলো রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ বহন ও চিকিৎসার পর তাদের ক্যাম্পে ফেরার নিশ্চয়তা দেয়। স্বাস্থ্য খাতের সঙ্গে যুক্ত কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গা শিবির এবং এর আশেপাশের স্বাস্থ্য সুবিধা কার্যক্রম সম্পর্কে সব ধরনের তথ্য রাখে । এ থেকে পাওয়া তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী শরণার্থীদের নূন্যতম চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়।

ভাসান চরে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মধ্যম ও উচ্চতর চিকিৎসা সুবিধা নেই। বড় ধরনের কোনো সমস্যা হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য

দ্বীপের বাইরে যাওয়ার দরকার হয়। তবে কোনো রোগীর মূল ভূখণ্ডে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন, অনুকূল আবহাওয়া ও নৌকার প্রাপ্যতার মতো নানা শর্তের জন্য এই প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। সরকার জুলাই মাসে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের করোনা টিকা দেওয়ার ঘোষণা দেয়। টিকা দেওয়া শুরু হয় আগস্ট মাসে। জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় এই টিকাদান কর্মসূচিতে প্রথম ধাপে ৫৫ বছরের বেশি বয়সী রোহিঙ্গাদের টিকা দেওয়া হয়। অক্টোবর মাস পর্যন্ত ৩৬ হাজার ৯৪৩ জন শরণার্থী প্রথম ডোজ এবং ৩৩ হাজার ৩৮৬ জন দ্বিতীয় ডোজের টিকা পান। অক্টোবর মাসেই দ্বিতীয় ধাপে ৫০ বছরের বেশি বয়সী রোহিঙ্গাদের টিকা দেওয়ার কাজ শুরু হয়। বছরের শেষ দিকে স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা টিকার প্রাপ্যতার ওপর নির্ভর করে আরও বেশি প্রাপ্তবয়স্ক লোককে টিকা দেওয়ার বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলছিলেন। ডিসেম্বর মাসে সরকার টিকার কার্যক্রম ১৮ থেকে ৫৪ বছর বয়সীদের মধ্যে সম্প্রসারিত করে এবং এর ফলে আনুমানিক তিন লাখ ৯৩ হাজার ১৯৩ জন টিকা পায়।

সরকার এসব শরণার্থীকে এদেশে পুনর্বাসন বা নাগরিকত্ব দেওয়ার বিষয়টি অনুমোদন করেনি। তারা বরাবরের মতই বলেছে যে, এই সমস্যার একমাত্র গ্রহণযোগ্য সমাধান হলো বার্মায় (মিয়ানমারে) তাদের ফিরিয়ে নেওয়া।

### ছ. রাষ্ট্রহীন মানুষেরা

এ দেশে থাকা রোহিঙ্গারা আইনত এবং বস্তুত রাষ্ট্রহীন মানুষ। তারা এখানে কোনো নাগরিকত্ব পায়নি। আবার বার্মার সরকারও তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে না।

নাগরিকত্ব আইন ১৯৫১ অনুযায়ী, বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করা যে কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক। কিন্তু এ নিয়ম রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আইনের ২০০৯ সালের একটি সংশোধনীতে দেশটিতে জন্মগ্রহণকারী যে কেউ বাংলাদেশী মা বা বাবার নাগরিকত্ব দাবি করার অধিকার পায়। এই সংশোধনীটি ২০০৯ সালের আগে রাষ্ট্রহীন পিতার ঔরসে দেশে জন্মগ্রহণকারী রোহিঙ্গা শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি, যারা রাষ্ট্রহীনতার ঝুঁকিতে রয়ে গেছে। ২০০৯ সালের সংশোধনী সত্ত্বেও একজন বাংলাদেশি ও একজন রোহিঙ্গার ঘরে জন্ম নেওয়া শিশুকে নাগরিকত্ব না দেওয়ার উদাহরণ আছে।

## অধ্যায় ৩: রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের স্বাধীনতা

সংবিধান দেশের প্রতিটি নাগরিককে সার্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত অবাধ, নিরপেক্ষ ও পর্যায়ক্রমিক ভোটে সরকার নির্বাচন করার অধিকার দিয়েছে।

## নির্বাচন ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

**সাম্প্রতিক নির্বাচনসমূহ:** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ ২০১৮ সালের সর্বশেষ নির্বাচনে টানা তৃতীয় বারের মত পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। পর্যবেক্ষকেরা এ নির্বাচনকে অবাধ বা নিরপেক্ষ কোনোটাই বলেননি। নির্বাচনে ব্যালট বাক্সে জাল ভোট ভরা এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের এজেন্ট ও ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের মত অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। ৩০০ সরাসরি ভোটে নির্বাচিত আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ও তার জোটের দলগুলো ২৮৮ টি আসন পায়। মোট প্রদত্ত ভোটের ৮০ শতাংশের বেশি যায় তাদের ঝুড়িতে। অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এবং তাদের জোট পায় মাত্র সাতটি আসন। জাতীয় সংসদ প্রধান বিরোধী দলের স্বীকৃতি দিয়েছে আওয়ামী লীগের জোটভুক্ত জাতীয় পার্টিকে। সংসদে তাদের আসন সংখ্যা ২২। নির্বাচনী প্রচারণার সময় বিরোধীদলীয় অনেক প্রার্থী এবং তাদের সমর্থকদের হয়রানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন, নির্বিচার গ্রেপ্তার এবং সহিংস ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলে অনেক বিরোধীদলীয় প্রার্থীই মুক্তভাবে প্রচার চালাতে বা নির্বাচনী সভা-সমাবেশ করতে পারেননি।

২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের সময় সরকার এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশন এর বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক নির্বাচন পরিদর্শককে একটি বিশ্বাসযোগ্য আন্তর্জাতিক পরিদর্শন সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের মধ্যে দরকারী কাগজপত্র ও ভিসার অনুমোদন দেয় নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ২২ টি নির্বাচন ওয়ার্কিং গ্রুপ এনজিও'র মধ্যে মাত্র সাতটিকে অনুমোদন দিয়েছিল।

নির্বাচনের প্রচারণা ও ভোট গ্রহণের সময় বিরোধীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, বিরোধী দল সমর্থিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্বল্প মাত্রার সহিংসতা, কেন্দ্রে কম ভোটার উপস্থিতি - গত বছর অনুষ্ঠিত বেশ কয়েকটি স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য ছিল এমনই। 'নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে'—এমন অভিযোগ এনে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ২৮ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী পৌরসভা নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা দেয়। এ বছর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের উপনির্বাচনগুলোতে কাউকে দলীয় মনোনয়নও দেয়নি বিএনপি। এসব নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল খুব কম। আবার কিছু জায়গায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' জিতে যায়।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, গত বছরের জুন থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এবং তাদের সমর্থকদের মধ্যে অন্তর্দলীয় কোন্দলজনিত সহিংসতায় ৫০ জনের বেশি নিহত হয়। বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী, বছরজুড়ে ৯৩২ টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় নিহত হয় ১৫৭ জন। আহতের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার ৮৩৩। একজন প্রার্থী প্রকাশ্যে গর্বভরে বলেন, সরকারি কর্মকর্তা এবং নিরাপত্তা বাহিনী তাঁকে সমর্থন করে। তিনি হুমকি দিয়ে বলেন, ভোট গোপনে হবে না। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের নির্বাচনী বিধি লংঘনের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন প্রকৃত অর্থে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি। আওয়ামী লীগের নেতারা এসব সহিংসতাকে 'অতি উৎসাহী' প্রার্থীদের তৎপরতা বলে অ্যাখায়িত করার চেষ্টা করেন।

**রাজনৈতিক দলসমূহ ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ:** বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা করতে সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে কাজে লাগায়। বিরোধী দল বিএনপির দাবি ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে পুলিশ তাদের হাজার হাজার নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগে মামলা করে এবং অনেক নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অভিমত এসব মামলার মধ্যে অনেকগুলোই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

বিরোধী মতাদর্শের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হয়রানির কারণে তাদের মত প্রকাশ এবং সমাবেশ করার সাংবিধানিক অধিকার চর্চা করতে পারেনি। রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামির নিবন্ধন বাতিল করেছে সরকার । এ কারণে জামায়াতের নামে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছে না দলটির নেতা-কর্মীরা। তাদের মত প্রকাশের এবং সমাবেশ করার মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সরকার এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সমালোচক বলে মনে হলে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে সরকারি ভয়ভীতির মুখে পড়তে হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন কমিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো স্বআরোপিত সেন্সরশিপে বাধ্য হয়।

আওয়ামী লীগ সমর্থিত বিভিন্ন সংগঠন যেমন এর ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (বিসিএল) বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন স্থানে দায়মুক্তির সাথে সহিংস কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ আছে। বিরোধী

দলগুলোর নেতা-কর্মীরা এসবের অন্যতম শিকার হন বলে জানা যায়। নরসিংদী জেলার মনোহরদীতে ১৮ আগস্ট কোভিড-১৯ এ ভুক্তভোগী কিছু মানুষকে সহায়তা দিতে বিএনপি আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ছাত্রলীগের সমর্থকেরা হামলা করে। এ ঘটনায় দুজন সাংবাদিকসহ ২০ জন আহত হয়। ছাত্রলীগ ২৯ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপির ছাত্র সংগঠনের একটি শোভাযাত্রায় হামলা করে। এতে ১৯ শিক্ষার্থী আহত হয়।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র আবরার ফাহাদ রাব্বীকে ২০১৯ সালে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে এ হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে একটি দ্রুত বিচার টাইব্যুনাল ছাত্রলীগের ২৫ কর্মীকে অভিযুক্ত করে। আবরারকে জামায়াতে ইসলামির ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে এবং ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক কয়েকটি চুক্তি নিয়ে অনলাইনে সমালোচনামূলক মন্তব্য করার জন্য হত্যা করা হয়। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালে বিচার কাজ চলছিল।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বিরুদ্ধে আগের বছরগুলোতে করা ৮৬টি ফৌজদারি মামলা এ সময় অমীমাংসিত ছিল। জামিনে মুক্ত রয়েছেন আলমগীর। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে পুলিশের ওপর হামলা, বাসে আগুন দেওয়া এবং বোমা হামলার ঘটনা।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার বিরোধী দলগুলোর অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করেছে। যেমন বিরোধী দলগুলোর জনসমক্ষে অনুষ্ঠান বা তাদের অনুষ্ঠান সংবাদমাধ্যমে প্রচারে বাধার সৃষ্টি করা হয়। তবে কোভিড-১৯ এর কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড বাইরে তেমনটা হয়নি। মহামারি তাদের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান করতে বাধ্য করেছে বলা যায়।

**নারী ও সংখ্যালঘু সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণ:** নারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সংকুচিত করে এমন কোনো আইন বাংলাদেশে নেই। তারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেনও। জাতীয় সংসদের ৫০ টি আসন আরও ২৫ বছর নারীদের জন্য সংরক্ষিত রেখে ২০১৮ সালের সংসদে সংবিধান সংশোধন করা হয়। সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৩০০ সংসদ সদস্য সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য মনোনয়ন দেন। জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলগুলোর আসন সংখ্যার আনুপাতিক হারে নারী সংসদ সদস্য মনোনয়ন দেওয়া হয়। ২০২০ সালের মধ্যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য রাখার যে সংসদীয় নিয়ম ছিল তা পূরণ করতে কোনো দল সক্ষম হয়নি। ফলে নির্বাচন কমিশন এই নিয়মটি সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেছে।

## অধ্যায় ৪. সরকারের দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতা

সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির জন্য আইনে দণ্ড প্রদানের বিধান রয়েছে , কিন্তু সরকার এসব আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেনি। বছর জুড়ে সরকারের দুর্নীতির অসংখ্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, আর দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তারা এসব থেকে দায়মুক্তি পেয়ে গেছেন।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অনেক গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে এবং দুর্নীতির রিপোর্ট করায় নাগরিকদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে । (অধ্যায় ২.ক. দ্রষ্টব্য)

একটি স্বাধীন পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে কাজ করার লক্ষ্যে ২০০৪ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গঠিত হয়। সংস্থাটি মূলত ঘুষ, আত্মসাৎ, চাঁদাবাজি, দায়িত্বে অবহেলা এবং অন্যায্য রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সংশ্লিষ্ট দূর্নীতির মামলাগুলোয় দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেও এর কার্যক্রম এতেই সীমাবদ্ধ নয়। সরকারি কর্মকর্তা ও শাসক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা দুর্নীতির তদন্ত করতে গেলে দুর্নীতি দমন কমিশনকে অবশ্যই সরকারের অনুমতি নিতে হয়। স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনসমূহের দাবি অনুযায়ী, শাসক দলের রাজনীতিক ও আমলারা তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও মামলা থেকে রেহাই পান, তবে বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আইনী প্রক্রিয়া, তদন্ত এবং মামলা অব্যাহত থাকে। তাই মানবাধিকার সংগঠনগুলো দুদকের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

**দুর্নীতি**: দুর্নীতি বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা। বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়ে ভূমিহীনতা নিরসনের লক্ষ্যে জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আট লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারকে সরকারি উদ্যোগে বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার ঘোষণা দেয়। জুলাই মাসে গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ৩৬টি উপজেলায় ঘর নির্মাণ প্রকল্পে দুর্নীতি ও নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। এসব প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে অনিয়মের বিরুদ্ধে 'শূন্য সহিষ্ণুতা' দেখানোর ঘোষণা আসে, অভিযোগ যাচাই করতে প্রধানমন্ত্রী পাঁচজন কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন এবং প্রকল্পের প্রশাসনিক বিষয়ে পরামর্শ প্রদানে কারিগরী কমিটিও গঠন করা হয়। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব 'একটি ত্রুটিহীন প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রশাসনের ব্যর্থতার' দায় স্বীকার করেন।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান আল জাজিরার অনুসন্ধানী দল ১ ফেব্রুয়ারি 'অল্ দ্য প্রাইম মিনিস্টারস মেন' নামে একটি তথ্যচিত্র প্রকাশ করে। দুই বছরের কথিত ঘটনা ধরে নির্মিত এই অনুসন্ধানী তথ্যচিত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক সেনাপ্রধান আজিজ আহমেদসহ রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যক্তিবর্গের দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগের কথা উঠে আসে। (অধ্যায় ২.ক. দ্রষ্টব্য) এই তথ্যচিত্রে আজিজ আহমেদের পরিবারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ছাড়াও র‍্যাবের মত নিরাপত্তা সংস্থার বিরুদ্ধে ঘুষ ও অনিয়ম বিষয়ক অভিযোগ তুলে ধরা হয়। এই তথ্য চিত্রে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকা দেশ ইসরায়েলের কাছ থেকে সরকারের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর নজরদারি করার জন্য যন্ত্রপাতি কিনে আনে। এই অনুসন্ধানী ভিডিওচিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসব অভিযোগকে প্রত্যাখ্যান করে বিবৃতি দেয়। বিবৃতিতে এসব কর্মকাণ্ডকে বিদেশে বসে থাকা সরকার বিরোধীদের সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার অপচেষ্টা বলে চিহ্নিত করা হয়।

করোনা মহামারিকালে সরকার ঘোষিত লকডাউনের সময় স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের জন্য সহায়তা হিসেবে দেওয়া খাদ্য ও অর্থ আত্মসাতের খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এসব প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রী ৬৪ জন মধ্যম সারির কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তাকে ত্রাণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রদানের দায়িত্ব দেন। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, সরকারের নির্বাহী বিভাগের তত্ত্বাবধানে সরকারি কর্মকর্তারা ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। জুন মাসে সরকার এবং বিরোধী উভয় দলের কিছু রাজনীতিক এভাবে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রমের সমালোচনা করেন। তারা অভিযোগ করেন, সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণে সরকারি কর্মকর্তারা দুর্নীতিগ্রস্ত এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠছেন। বিরোধী দলের সাংসদগণ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মহামারিকালে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা এবং যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা দিতে না পারার সমালোচনা করেন।

৬ জুন ক্ষমতাসীন দলের এক সাংসদ অভিযোগ করেন, সরকারের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দুর্নীতি ও অর্থপাচার ঘটছে। সরকারের আরেক জ্যেষ্ঠ সাংসদ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজগুলোর আয়ের ওপর কর আরোপ সম্পর্কিত সরকারের বাজেট প্রস্তাবের সমালোচনা করেন।

## অধ্যায় ৫: মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি সংগঠনগুলোর অনুসন্ধানের প্রতি সরকারের অবস্থান

বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন সাধারণত সরকারের কিছু বিধিনিষেধ মেনে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং  তারা অনুসন্ধান করে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সরকারি কর্মকর্তারা এসব প্রতিবেদনের ব্যাপারে খুব কম ক্ষেত্রেই সহযোগিতা করেছেন বা সাড়া দিয়েছেন।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো প্রায়ই সরকারের কঠোর সমালোচনা করলেও,  তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করে। দেশের সুশীল সমাজের কার্যকারিতা খর্ব করা এবং তাদের কাজে সরকারের বাধা দেওয়ার কৌশল নিয়ে পর্যবেক্ষকেরা কথাবার্তা বলেছেন। চরমপন্থীদের হুমকি এবং শাসক দলের ক্রমবর্ধমান চাপে এই প্রবণতা বাড়ছে। শাসক দল সমর্থিত সুশীল সমাজের সদস্যরাও বলছেন, জনসম্মুখে সরকারের সমালোচনা করলে নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে তাদের গ্রেপ্তারের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের অর্থায়ন এবং তাদের কাজে বাধা দেওয়ার সরকারি প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে এ সময়। প্রতিষ্ঠানটিকে প্রতিনিয়ত হয়রানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয় বলে তারা অভিযোগ করেছে। সরকারি কর্মকর্তা এবং আইনশৃংখলা বাহিনীর কর্মকর্তারা তাদের কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারি করেন। এছাড়া তাদের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি ভন্ডুল করে দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে ।১৪ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট অধিকারের সম্পাদক ও পরিচালকের বিরুদ্ধে মামলা খারিজের আবেদন নাকচ করে দেনএবং আদালত সাইবার ক্রাইমস টাইব্যুনালে এ মামলার কার্যক্রম চালুর নির্দেশ দেন। ২০১৪ সালের শেষ দিক থেকে অধিকারের এনজিও সনদ নবায়নের বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়েছে।  ৫ অক্টোবর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ২০১৩ সালে দায়ের করা মামলায় অধিকারের সম্পাদক আদিলুর রহমান খান এবং পরিচালক নাসিরউদ্দিন এলানের বিরুদ্ধে মামলার বিচারকাজ শুরু হয়। ।

বাংলাদেশ সরকারের নিয়ম অনুযায়ী ধর্মীয় সংগঠনসহ সব ধরনের এনজিওকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে নিবন্ধন নিতে হয়। স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক যেসব সংস্থা সংবেদনশীল বিষয় ও গোষ্ঠী যেমন, নিরাপত্তা বাহিনীর অনিয়ম, ধর্মীয় বিষয়াবলী, মানবাধিকার, আদিবাসী জাতিসত্তা, এলজিবিটিকিউআই সম্প্রদায় ও রোহিঙ্গা শরণার্থী বা শ্রম অধিকার নিয়ে কাজ করে তাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সরকারি বিধিনিষেধের মুখোমুখি হতে হয়। ( অধ্যায় ২.খ. এবং ৭.ক. দ্রষ্টব্য) এসব গোষ্ঠীর মধ্যে কেউ কেউ অভিযোগ করেছে, গোয়েন্দা বাহিনী তাদের কাজের ক্ষেত্রে নজরদারি করে। সরকার

কখনো কখনো প্রকল্প নিবন্ধনের ক্ষেত্রে দেরি করে, বন্ধ করে কিংবা ভিসা প্রত্যাখান করে আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংগঠনসমূহের কাজে বাধা সৃষ্টি করে।

দেশের সংবিধান, দেশের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে 'অবমাননাকর' মন্তব্য করলে রাষ্ট্রীয় আইনের যুক্তি দিয়ে সরকার এনজিওগুলোর অর্থায়ন বন্ধ করে দিতে পারে । অধিকার বিষয়ক দলসমূহ এসব বিধানকে এনজিওগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বলে মনে করে।

**জাতিসংঘ বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা**: জাতিসংঘের গুম সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের বাংলাদেশ সফরের অনুরোধের প্রতি সাড়া দেয়নি সরকার। জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কের কার্যালয়ের সূত্র অনুযায়ী, ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশে আসতে জাতিসংঘের বিশেষ দূতদের ১৫৮টি অনুরোধ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে আছে বিচার বর্হিভূত বা নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত বিশেষ দূত; শান্তিপূর্ণ সমাবেশ এবং সংগঠন করার স্বাধীনতার অধিকার সংক্রান্ত বিশেষ দূত; এবং সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমের সময় মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার উন্নয়ন এবং সুরক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ দূত।

৪ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের মহাসচিবের মুখপাত্র সেনাবাহিনী সংক্রান্ত দুর্নীতি ও অনিয়মের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনুসন্ধানের আহ্বান জানায়। ইসরায়েল থেকে গোয়েন্দা নজরদারি করার জন্য যন্ত্রপাতি কেনার অভিযোগের বিষয়ে উদ্বেগ জানায় জাতিসংঘ। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা জানান, এসব যন্ত্রপাতি জাতিসংঘ শান্তি মিশনে পাঠানো সেনাবাহিনীর একটি ইউনিটের জন্য আনা হয়, তবে জাতিসংঘের এক মুখপাত্র জানান, জাতিসংঘের শান্তি রক্ষী বাহিনীতে নজরদারির যন্ত্রপাতি মোতায়েন করা হয়নি । মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দাবি, এসব নজরদারির যন্ত্রপাতি বিরোধী দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে নজরদারিতে ব্যবহার করা হয়। (অধ্যায় ২.ক. দ্রষ্টব্য)

৬ ফেব্রুয়ারি, সাতটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আবেদন জানায়। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীগুলোতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি সদস্য রয়েছে। সারা বিশ্বে মোতায়েনকৃত শান্তিরক্ষী বাহিনীগুলোতে এখন বাংলাদেশের ইউনিফর্ম পরিহিত ছয় হাজার ৮০০ জন সদস্য কাজ করছে।

**সরকারের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহ:** বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সাত সদস্যবিশিষ্ট, এর মধ্যে পাঁচজন সাম্মানিক সদস্য। মানবাধিকার

কমিশনের মূল কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সমূহের তদন্ত করা, আইনের বৈষম্য নিরূপণ করা, জনগণকে মানবাধিকার সম্পর্কে জানানো এবং গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার বিষয়াবলী সম্পর্কে  সরকারকে পরামর্শ দেওয়া। কিছু মানবাধিকার সংগঠন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা এবং এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাদের অভিযোগ, সরকার অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মতো জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকেও তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে।

## অধ্যায় ৬: বৈষম্য ও সামাজিক নিগ্রহ

### নারী

**ধর্ষণ এবং পারিবারিক সহিংসতা**:  বাংলাদেশের আইনে পুরুষের মাধ্যমে মেয়ে শিশু বা নারী ধর্ষণ এবং পারিবারিক সহিংসতা অপরাধ, কিন্তু আইনে বৈবাহিক অবস্থায় ১৩ বছরের বেশি বয়সী মেয়ে বা নারীকে বৈবাহিক ধর্ষণের শিকার হিসেবে গণ্য করা হয় না। দেশে ধর্ষণের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা ফাঁসি।

বিশ্বস্ত মানবাধিকার সংস্থাগুলি দেখেছে যে, দেশে ধর্ষণ একটি গুরুতর সমস্যা হিসাবে রয়ে গেছে, সারা বছর ধরে রিপোর্ট করা ধর্ষণের ঘটনাসমূহ মোটামুটি আগের বছরের সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে।  দেশীয় মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী, এ বছর অন্তত এক হাজার ৩২১ নারী ধর্ষণের শিকার হন। মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের হিসাব অনুযায়ী, ২০২০ সালে এক হাজার ৫৩৮ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হন; এর মধ্যে ৫৭৭ জন নারী এবং ৯১৯ জনের বয়স ১৮ বছরের নিচে। অনেক সময় ধর্ষণের পর ধর্ষণকারীরা ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ আছে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো জানিয়েছে, মহামারিকালে নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতার পরিমাণ বেড়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র জানায়, এ সময় ৬৪০ নারী পারিবারিক সহিংসতার শিকার হন, এর মধ্যে ৩৭২ জন সহিংসতার শিকার হয়ে মারা যান। করোনাকালে এনজিওসমূহ লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বেড়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে কাজ করেছে। যৌন সহিংসতার ঘটনায় বিচারহীনতার বিষয়টিও উঠে এসেছে এ সময়। ১৪ জুন অভিনেত্রী শামসুন্নাহার স্মৃতি (পরীমনি নামে বেশি পরিচিত) তাঁকে ঢাকা বোট ক্লাবে ধর্ষণ ও হত্যার চেষ্টার অভিযোগে ব্যবসায়ী নাসির মাহমুদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ৪ আগস্ট র‍্যাব পরীমনির ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে তাঁকে সেখান থেকে বের করে দেয়। র‍্যাব ওই ফ্ল্যাট

থেকে মদ ও মাদকদ্রব্যসহ অবৈধ দ্রব্যাদি পায় বলে অভিযোগ করেছে। কিছু মানবাধিকার কর্মী বলেন, প্রভাবশালী একজন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা করার কারণেই পুলিশ পরীমনির বাসায় তল্লাশি চালায়।

২৬ এপ্রিল কলেজ ছাত্রী মোশারাত জাহান মুনিয়ার মৃতদেহ পাওয়া যায় তাঁর ঢাকার ফ্ল্যাটে। মুনিয়ার বোন নুসরাত জাহান বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীরকে এ আত্মহত্যায় প্ররোচনাদানকারী হিসেবে অভিযুক্ত করে মামলা করেন। ১৯ জুলাই মুনিয়ার মৃত্যুতে আনভীরকে অব্যাহতি প্রদান করে চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দেয় পুলিশ। ২৬ জুলাই দেশের ৫১ জন অধিকার কর্মী ও নেতৃবৃন্দ এ ঘটনার পুনঃতদন্ত দাবি করে বিবৃতি দেন। তাঁরা বলেন, 'দেশে আইনের শাসনের ওপর মানুষের আস্থা বজায় রাখতে হলে মুনিয়ার আত্মহত্যা বা হত্যাকান্ডের  যথাযথ তদন্ত ও সঠিক বিচার দরকার বলে আমরা মনে করি।'

২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে সিলেটে একটি গণধর্ষণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য এবং নারীর প্রতি নিগ্রহবিরোধী স্থানীয় সংগঠন ফেমিনিস্ট অ্যাক্রোস জেনারেশনস লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতাকে জরুরী জাতীয় অবস্থা হিসেবে অভিহিত করে 'ধর্ষণের বিরুদ্ধে ঘৃণা' নামকএক আন্দোলন শুরু করে। । সংগঠনটি ১০ দফা তুলে ধরে আইন সংস্কারের দাবি জানায়। তারা বলে, ধর্ষণের বিরুদ্ধে ফাঁসির ব্যবস্থা এই ধর্ষণ সংস্কৃতি কমাতে পারবে না। সংগঠনটি নারী ও মেয়েদের সহিংসতা থেকে সুরক্ষা দেওয়া ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে কাজ করে। এর পাশাপাশি ১৭ সংগঠনের জোট  'রেপ ল রিফর্ম কোয়ালিশন'  'ধর্ষণের আইন এখনই সংস্কার করো' শীর্ষক  প্রচারণা  পরিচালনা করে, যেখানে সংগঠনটি আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে ১০ দফা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবি জানায়।

ধর্ষণের ঘটনার তদারকি সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী, ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়নের যেকোন  ঘটনা যেখানেই ঘটুক না কেন, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অবশ্যই এ সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করবেন। ঘটনা জানার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই রাসায়নিক এবং ডিএনএ পরীক্ষা করাতে হবে। এই নির্দেশিকায় আরও বলা আছে, প্রতিটি থানায় একজন নারী পুলিশ কর্মকর্তা থাকবেন যিনি কর্তব্যরত কর্মকর্তা ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়নের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার সময় উপস্থিত থাকবেন। ভুক্তভোগীর জবানবন্দি অবশ্যই একজন আইনজীবী, সমাজকর্মী, সুরক্ষা কর্মকর্তা বা ভুক্তভোগী যথাযথ বলে বিবেচনা করেন এমন কোনো ব্যক্তির সামনে লিপিবদ্ধ হতে হবে। ভুক্তভোগী প্রতিবন্ধী হলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাঁকে সরকারিভাবে অনুবাদ পরিষেবা প্রদান করতে হবে এবং  একজন নারী

পুলিশ কর্মকর্তাকে সাথে নিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা সময়মত ভুক্তভোগীর মেডিকেল পরীক্ষা করাতে নিয়ে যাবেন।

দায়মুক্তির সংস্কৃতির কারণে ধর্ষণের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে বলে মত দিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং মানবাধিকার গোষ্ঠী। মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষকদের মতে আইনি সেবা প্রাপ্তির সুযোগের অভাব, সামাজিক কলঙ্ক, আরও হয়রানির ভয়, এবং সাক্ষী হাজির করার আইনি শর্তের কারণে অনেক ভুক্তভোগী অভিযোগ করেন না। এছাড়া আইনত চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণাদির মাধ্যমেধর্ষণের ঘটনা প্রমাণের দায় ধর্ষিতার ওপরই বর্তায়।

**প্রথাগত অন্যান্য ক্ষতিকর চর্চা:** কিছু সংবাদমাধ্যম ও এনজিও নারীদের ওপর যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতা অব্যাহতথাকা বিষয়ে রিপোর্ট করে, যদিও সাম্প্রতিক সময়ে আইনে পরিবর্তন আনায়নের মাধ্যমে যৌতুক নিষিদ্ধ করা হয়েছে । আইন অনুসারে যৌতুক দাবি করলে অথবা প্রদান করলে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড, জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে। আসক জানিয়েছে, নারীদের ওপর এ বছর ২১০টি যৌতুক সংশ্লিষ্ট সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, একই সাথে ৭২ জন নারী যৌতুক সংশ্লিষ্ট বিবাদের কারণে নিহত হয়েছেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জে যৌতুকের সোনার গহনা না দেওয়ায় লিমা খাতুন নামক এক নারীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ ওঠে তাঁর স্বামী ও স্বামীর স্বজনদের বিরুদ্ধে। ১ মার্চ যৌতুকের দাবিতে রুনা বেগম নামক এক নারীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। প্রাথমিকভাবে১ লাখ টাকা যৌতুক নেয়ার পরও তাঁর স্বামী আরও যৌতুক দাবি করে আসছিল। সংবাদমাধ্যম জানায়, পুলিশ রুনার স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে। যৌতুকের জন্য মেয়ের শ্বশুরের অব্যাহত চাপের মুখে ৯ এপ্রিল জামাল নামের এক প্রতিবন্ধী রিকশাচালক চট্টগ্রামে নিজ বাড়িতে আত্মহত্যা করেন।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের এক আদেশ অনুসারে শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয় সুরাহা করতে ফতোয়া দেওয়া যাবে, তবে তা শাস্তিকে বৈধতা দিতে কিংবা ধর্ম নিরপেক্ষ আইন রহিত করতে ব্যবহার করা যাবে না। ইসলামি নিয়মানুসারে ইসলামি আইন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এমন ধর্মীয় পন্ডিত ব্যক্তিরাই শুধুমাত্র ফতোয়া দিতে পারবেন। এই বিধিনিষেধ সত্ত্বেও গ্রাম্য ধর্মীয় নেতারা কখনো কখনো ফতোয়া দিয়ে বসেন। এর ফলে নৈতিক সীমালঙ্ঘনের অভিযোগে বিচারবহির্ভূত শাস্তির ঘটনাও ঘটে, যা প্রায়শই নারীর ওপর সংঘটিত হয়।

কখনো কখনো ফতোয়া প্রদানকারী ধর্মীয় নেতাদের  মাধ্যমে নারীদের সতর্ক করার ঘটনাও ঘটেছে। এসব ঘটনার মধ্যে বেত্রাঘাত, মারধর এবং অন্যান্য ধরনের শারীরিক নির্যাতনও রয়েছে।

অ্যাসিড সন্ত্রাসের স্বীকার হয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীদের চেহারা বিকৃতহয়েছে এবং কখনো কখনো তারা অন্ধও হয়েছেন। বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় অথবা জমি কিংবা অর্থ নিয়ে বিরোধের জেরে নারীদের ওপর অ্যাসিড হামলার ঘটনা ঘটেছে। বছরের প্রথম ছয় মাসে মোট ১১টি অ্যাসিড হামলার তথ্য পাওয়া গেছে।

**যৌন হয়রানি:** ২০০৯ সালে হাইকোর্ট এক আদেশের মাধ্যমে যৌন হয়রানি নিষিদ্ধ করলেও একাধিক এনজিওর তথ্যমতে এ ধরনের হয়রানির ( যা 'ইভ টিজিং' নামে পরিচিত)  ঘটনা ঘটেছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময় খাদ্য সহায়তা  গ্রহণকালে নারীদের যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার কয়েকটি ঘটনার সন্ধান পেয়েছে স্থানীয় মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। বছরের প্রথম নয় মাসে নারীদের প্রতি মোট ১০১টি যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে।

**প্রজনন অধিকার:** সরকারি কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জোরপূর্বক গর্ভপাত বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে বন্ধ্যাকরণ বা খোজাকরণের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো জানিয়েছে, বাল্যবিয়ের শিকার নারীদের পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণের সক্ষমতা কম। বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ (বিডিএইচএস) ২০১৭-১৮ অনুসারে প্রতি পাঁচ কিশোরীর তিনজনের ১৮ বছরের কম বয়সে বিয়ে হয়েছে। কিশোর বয়সে নারীদের সন্তান জন্মদানের হার ২৮ শতাংশ। ইউনিসেফও জানিয়েছে, বাল্যবিয়ের শিকার প্রতি ১০ নারীর মধ্যে পাঁচজন ১৮ বছরের কম বয়সে এবং প্রতি ১০ জনের মধ্যে আটজন ২০ বছরের কম বয়সে সন্তান জন্ম দিয়েছে।

এলজিবিটিকিউআই+ গোষ্ঠীগুলো অভিযোগ করেছে, সমকামী ও উভকামী নারীরা ন্যূনতম যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

সরকার, এনজিও এবং ব্যবসায়িক ক্লিনিক ও হাসপাতালগুলো দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসহ জন্মনিয়ন্ত্রণের সব ধরনের পদ্ধতির সেবা দিয়েছে। নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোকে সিংহভাগ ক্ষেত্রে বিনামূল্যে সরকারি পরিবার পরিকল্পনা সেবার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও পারিবারিক প্রথা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করেছে। যৌন

নিপীড়নের শিকার নারীদের গর্ভনিরোধক সেবা প্রদান করার জন্য সরকারি জেলা হাসপাতালসমূহে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেন্টার এর ব্যবস্থা ছিল।

পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে কার্যকর তথ্যপ্রাপ্তি জাতীয় জনসংখ্যা নীতির (২০১২) অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। জাতীয় নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তথ্যপ্রাপ্তির ভিত্তিতে পদ্ধতি বেছে নেওয়ার এবং স্বেচ্ছায় পদ্ধতিগ্রহণের ওপর জোর দিয়ে পরিবার পরিকলাপনা সেবাগুলো দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রাহকের যোগ্যতা নিরূপণে সহযোগিতা, পরিবার পরিকল্পনা নির্দেশিকা এবং দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী পদ্ধতির ক্ষেত্রে গ্রাহকের সম্মতিপত্রের ব্যবস্থা করেছে। পরিবার পরিকল্পনা সেবাদাতা কর্মীদের প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ও পদ্ধতি বেছে নেওয়ার ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিকতম হিসাব মতে, ২০০০ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত দেশে মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে। এই সময়ের মধ্যে প্রতি এক লাখ শিশু জন্মের ক্ষেত্রে মাতৃমৃত্যুর হার ৪৩৪ থেকে ১৭৩-এ নেমেছে। বিডিএইচএস-এর তথ্যমতে, ১২ শতাংশ বিবাহিত প্রজননক্ষম নারী পরিবার পরিকল্পনার আওতায় আসতে পারেননি। গ্রামাঞ্চলে প্রশিক্ষিত সেবাদাতা ও সরঞ্জামের ঘাটতির মতো জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে তথ্য ও সেবাপ্রাপ্তি বাধাগ্রস্ত হয়েছে ।

মাসিক সংশ্লিষ্ট প্রচলিত সংকোচ ও অস্পষ্টতাসমূহ মাসিক হওয়া নারীদের জন্য সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। রক্ষণশীল সমাজে কোনো কোনো নারীর ক্ষেত্রে তো মাসিকের সময় অপবিত্র হবে বলে রান্নাঘরে যাওয়া অথবা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে দেওয়া হয় না।

কোভিড-১৯ মহামারিজুড়ে বাল্য বিবাহ বেড়ে যাওয়ায় বিদ্যালয় থেকে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ঝরে পড়ার হার বেড়েছে। ইউনিসেফ বলেছে, যেসব মেয়ের বাল্যবিয়ে হয়েছে, তাদের বিদ্যালয়ে ফেরার সম্ভাবনা কম।

**বৈষম্য:** সংবিধান অনুযায়ী সকল নাগরিক আইনের সামনে সমান এবং আইনের অধীনে সমান সুরক্ষার অধিকারী। এটি "রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে" নারী-পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়টিকেও স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দেয়। তবে মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা এনজিওগুলোর তথ্যমতে, লিঙ্গসমতা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে সরকার সবসময় সংশ্লিষ্ট সংবিধান বা আইন অনুসরণ করেনি। পরিবার, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার আইনে নারীরা পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার পায় না। ইসলামি উত্তরাধিকার আইন অনুসারে, মেয়েসন্তান ছেলেসন্তানের তুলনায় উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির অর্ধেক পেয়ে থাকে। হিন্দু

উত্তরাধিকার আইন অনুসারে, বিধবা নারী কেবল তাঁর জীবদ্দশায় প্রয়াত স্বামীর সম্পদ ভোগ করতে পারবেন এবং মৃত্যুর সময় পুরুষ উত্তরাধিকারীকে সে সম্পদ হস্তান্তর করতে হবে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে হাইকোর্ট এক আদেশে বলেন, দেশের হিন্দু বিধবা নারীরা কৃষিজমিসহ প্রয়াত স্বামীর সব ধরনের সম্পদের অধিকারী হবেন। এর আগে হিন্দু বিধবা নারীরা কেবল তাঁর প্রয়াত স্বামীর ভিটেমাটির অধিকারী হতেন ।

## পদ্ধতিগত বর্ণ বা জাতিগত সহিংসতা ও বৈষম্য

আন্তঃজাতি সহিংস চরমপন্থার কারণে প্রভাবিত হয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর বড় ধরনের কোনো হামলার ঘটনা ঘটেনি। তবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সম্পদের ওপর ও মন্দিরে হামলার কিছু ঘটনা ঘটেছে এবং এসব ধর্মীয় গোষ্ঠীর কোনো কোনোটি অভিযোগ করেছে, মহামারির সময় ধর্মীয় অবকাঠামোয় হামলা বেড়েছে।

১৭ মার্চ সিলেটের একটি হিন্দু গ্রামে ৮৯টি বাড়িঘর ও আটটি মন্দিরে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়। সংবাদমাধ্যম ও নাগরিক সমাজ বলেছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরের নিন্দা জানিয়ে এক হেফাজত নেতার বক্তব্যের সমালোচনা করে ফেসবুকে এক স্থানীয়ের পোস্টের কারণে হেফাজতে ইসলামের শতাধিক সদস্য ওই হামলা চালায়।  ঘটনার পর সংগঠনটি ইউটিউবে দেওয়া এক ভিডিও বিবৃতিতে হামলার দায় অস্বীকার করে। সরকার এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে ঐ গ্রামে র‍্যাব পাঠায়। ২৩ মার্চ নাগাদ পুলিশ হামলার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা ধর্মীয় মৌলবাদকে ঘটনার জন্য দায়ী করেছে আর নাগরিক সমাজ ও বিরোধী দলীয় নেতারা এর জন্য ক্ষমতাসীন দলকে দায়ী করেছে। অন্য কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন স্থানীয় আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের হামলা প্রতিরোধের ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য দায়ী করেছে।

১৩ অক্টোবর সংবাদমাধ্যম জানায়, কুমিল্লায় দুর্গাপূজা উৎসবের সময় হিন্দু দেবতার কোলে পবিত্র কোরআন রাখা একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপর সহিংসতা শুরু হয় (অধ্যায় ১.ঘ ও ২.ক দ্রষ্টব্য)। সে সময় মুসলিম বিক্ষোভকারীরা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর ও মন্দিরে হামলা চালায় এবং বেশ কয়েকটি শহরে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। সহিংসতায় ছয়জন নিহত হয়, যাদের বেশির ভাগেরই মৃত্যু হয়েছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক করার চেষ্টারত নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সহিংসতার নিন্দা করেছেন, ধর্মীয় পরিচয়কে একপাশে রেখে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার উপর জোর দিয়েছেন এবং

সরকার হিন্দু ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছে। এনজিওগুলো জানিয়েছে, জাতি,বর্ণ  এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার সংখ্যালঘুরা বৈষম্যের শিকার হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ,  কিছু দলিত (নিম্ন বর্ণের হিন্দু ধর্মাবলম্বী) জমি,  যথাযথ বাসস্থান,  শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সীমিত সুযোগ পেয়েছে।

প্রায় ৩ লাখ উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী (বিহারি নামে পরিচিত, যারা উর্দুভাষী মুসলিম এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে পূর্ব পাকিস্তানে চলে এসেছিল) আগে রাষ্ট্রহীন অবস্থায় ছিল এবং এ জনগোষ্ঠীর সদস্যরা বলেছে, স্থায়ী ঠিকানা  না থাকার কারণে অভিবাসন কর্মকর্তারা প্রায়শ তাদের পাসপোর্টের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। এই জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ এখনো সত্তরের দশকে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দ্য রেডক্রস এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত শরণার্থী শিবিরের মতো ক্যাম্পে বসবাস করে। বিহারিরা সে সময় মনে করত, তারা ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পাকিস্তানে ফিরে যাবে। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) এক গবেষণায় দাবি করা হয়, বিহারি ক্যাম্পগুলোর পরিস্থিতি অত্যন্ত মানবেতর, অনেক ক্যাম্পেই শতাধিক বাসিন্দার জন্য ১০টিরও কম শৌচাগার রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকার মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে জানুয়ারি নাগাদ ৩০ হাজার বাসিন্দা ছিল।অনেক বয়স্ক বিহারীর হয়তো পাকিস্তানের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল কিন্তু আইআরআইয়ের গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা বলেছে, তারা নিজেদের বাংলাদেশি হিসেবেই পরিচয় দিতে চায়, বিশেষ করে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বেড়ে উঠেছে। ২০০৮ সালে হাইকোর্ট বিহারিদের অন্য বাংলাদেশি নাগরিকদের মতো অধিকার আছে বলে রায় দেওয়ার পর আন্তর্জাতিক দাতারা সহায়তা বন্ধ করে দেয়কারণ, তাত্ত্বিকভাবে তারা আর রাষ্ট্রহীন নয়। সরকার পানি ও বিদ্যুতের মত কিছু মৌলিক পরিসেবা দিলেও বিহারিরা বলেছে তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার। এ ছাড়া বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে একীভূত করার উদ্যোগ না থাকায় তারা জনাকীর্ণ ক্যাম্পে বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

সেপ্টেম্বর মাসে কিছুসংখ্যক বিহারি উদ্বেগ প্রকাশ করে যে, সরকারি কর্মকর্তারা বাংলাদেশি নাগরিকত্বের মর্যাদা বাতিল করে তাদের ভূমি অধিগ্রহণ করে নিতে পারেন এবং তাদের পাকিস্তানে ফিরে যেতে বাধ্য করার নীতিও বাস্তবায়ন করা হতে পারে।

**আদিবাসী সম্প্রদায়**

সরকারি চাকরি এবং উচ্চ শিক্ষায় কোটার সুবিধা থাকার পরও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায় ব্যাপক বৈষম্য ও নিগ্রহের শিকার হয়। এসব রীতি ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ফলে সৃষ্ট আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলোতেও আছে যদিও তাএখনো পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি,বিশেষ করে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট চুক্তির অংশটি। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা ভূমি কমিশন আইনের অধীনে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির বিষয়ে মতানৈক্যের কারণে তাদের জমি সম্পর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেনা।

২০২০ সালের এক গবেষণায় দেখা যায়, পার্বত্য অঞ্চলে করোনাকালে ভূমি দখল, জীবিকার ঝুঁকি এবং পাহাড়ি নারীর প্রতি সহিংতা বেড়েছে। বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে দারিদ্র্যের হার ২০ শতাংশ, কিন্তু সমতলের আদিবাসীদের মধ্যে এ হার ৮০ শতাংশের বেশি আর পার্বত্য চট্টগ্রামে দারিদ্র্যের হার ৬৫ শতাংশের বেশি। গবেষণায় আদিবাসী মানুষের স্বাস্থ্য সেবার ঘাটতির বিষয়টিও উঠে এসেছে। অন্যান্য সংস্থাগুলি নিশ্চিত করেছে যে আদিবাসীদের জন্য উপলব্ধ স্বাস্থ্যসেবা দেশের মূল ধারার মানুষের প্রাপ্য সুবিধার চেয়ে নিম্নমানের। ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে একদল আদিবাসী নেতা সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রান্তিক মানুষের জন্য যথাযথ পরিমাণ খাদ্য নিরাপত্তা দেয়ার দাবি জানান, তবে তা পূরণ হয়নি।

করোনা মহামারির সময় একাধিক এনজিও জানিয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে কাজ করা আদিবাসী মানুষদের চাকরি চলে যাওয়ায় ওই অঞ্চলে ব্যাপক খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে। যেহেতু সহায়তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এমন অনেক আদিবাসী প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করেন, যেখানে যানবাহন এর মাধ্যম পৌঁছানো কঠিন, তাই অনেক আদিবাসী সম্প্রদায় কোন সরকারী সহায়তা পাননি বলে জানিয়েছেন।

২০২০ সালের নভেম্বর মাসে ব্যবসায়িক সংগঠন সিকদার গ্রুপ, বাংলাদেশ আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সঙ্গে যৌথভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের চিম্বুক পাহাড়ে একটি পাঁচ তারকা হোটেল নির্মাণ শুরু করে। ওই এলাকা থেকে উচ্ছেদের আশংকায় এর প্রতিবাদ করে স্থানীয় ম্রো জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা। অধিকার কর্মীদের ভাষ্য অনুযায়ী, এই হোটেলের প্রকল্পের ফলে চার গ্রামের ১১৫টি ম্রো পরিবার বাস্তুহারা হবে, আর এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ১০ হাজার মানুষ অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হবে। আদিবাসী অধিকার সংগঠনগুলো বলছে, প্রথাগত আইনে প্রশ্নবিদ্ধ জমিটি আদিবাসীদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য এবং

আদিবাসীদের সম্মতি নিয়েই কেবল এই জমির হস্তান্তর হতে পারে। এসব সংগঠনের তথ্যমতে, যে স্থানে পাঁচ তারকা হোটেলের পরিকল্পনা হচ্ছে সেটি ফসলি জমি, যার ওপর ভিত্তি করেই স্থানীয় আদিবাসীরা জীবনধারন করে। জানুয়ারি মাসে বের হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, স্থানীয় ম্রো আদিবাসীদের সঙ্গে  হোটেল নির্মাণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাকবিতন্ডা হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের আদিবাসী সম্প্রদায়ও বাঙালি মুসলিমদের হাতে ভূমি হারাচ্ছে বলে জানা যায়। আদিবাসীদের অধিকার সংগঠনগুলোর তথ্য অনুযায়ী, রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির করার জন্য বন উজাড় এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কার্যক্রম আদিবাসীদের জমির মারাত্মক পরিবেশগত অবনতি ঘটিয়েছে, যা তাদের জীবিকাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে। মৌলভীবাজার এবং মধুপুর বনে আদিবাসীদের প্রথাগত মালিকানাধীন জমিতেসরকার বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশে ভূমির মালিকানা সরকারের হাতে। ভূমি বিরোধ তদন্ত এবং অবৈধভাবে দখল করা জমি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ভূমি কমিশন থাকলেও এ বছর কোনো ভূমি সমস্যার সমাধান হয়নি। একটি সংগঠনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আদিবাসী ও মুক্তিযোদ্ধা নাইকা মার্ডি ১০ বছর ধরে চেষ্টা করেও তার চার শতাংশ জায়গার  নিবন্ধন/দলিল করতে পারেননি। মার্ডি এ জমিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে থেকে বসবাস করছেন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যানারে বিভক্ত হয়ে চাকমা ও মার্মা আদিবাসী সম্প্রদায় আন্ত-সম্প্রদায়ভিত্তিক সহিংসতায় জড়িয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের সংঘাত চলমান। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এসব দলের অনেক নেতা চাঁদাবাজি, মাদক এবং অস্ত্র চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত। এদিকে, মৃত্যু এবং সহিংসতার ঘটনা অমীমাংসিত রয়ে গেছে।। একাধিক এনজিও এবং এসব ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আদিবাসীরা জানান, পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক দলগুলোর আন্ত-সম্প্রদায়ভিত্তিক সংঘাত দিন দিন বাড়ছে।

বাঙালি প্রতিবেশী অথবা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মাধ্যমে আদিবাসী নারী ও শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়নের ঘটনা অমীমাংসিত রয়েছে।

## শিশু

**জন্ম নিবন্ধন:** কোনো ব্যক্তি জন্মগতভাবে এ দেশের নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হয় যদি তাদের পিতামাতা বাংলাদেশি নাগরিক হন, কিংবা পিতা-মাতার

জাতীয়তা অজানা কিন্তু সন্তান বাংলাদেশি ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করে, অথবা তাদের পিতা বা পিতামহ যদি এমন অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন যা আগে এ দেশের অংশ ছিল না। সরকার এ দেশে জন্মগ্রহণকারী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্ম নিবন্ধন করেনি বা তাদের নাগরিকত্ব দেয়নি,তবে ইউএনএইচসিআর-কে শরণার্থী শিবিরের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনের অনুমতি দিয়েছে। কোনো ব্যক্তি বংশানুক্রমিকভাবে নাগরিকত্বের যোগ্য হলে তার পিতা বা পিতামহকে অবশ্যই ১৯৭১ সালে বা তার পরে এ ভূখণ্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট পেতে জন্ম নিবন্ধন প্রয়োজন।

## শিক্ষা

আইন অনুসারে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক। আর মেয়েদের দশম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলে রাখার জন্য সরকার অভিভাবকদের ভর্তুকি প্রদান করে।

বিনামূল্যে পাঠের সুযোগ এবং শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে সরকার বিনামূল্যে কোটি কোটি বই বিতরণ করা সত্ত্বেও শিক্ষকদের বেতন, অন্যান্য বই এবং ইউনিফর্ম অনেক পরিবারের জন্য বেশ ব্যয়বহুল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিতে লিঙ্গ সমতা দেখা যায়, কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমাপ্তির হার কমে যায়,যেখানে মেয়েদের তুলনায় বেশি ছেলে শিক্ষার্থী এই স্তরটি সম্পন্ন করে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মেয়েদের ঝরে পড়ার একটি কারণ ছিল অল্পবয়সে এবং জোর করে বিয়ে দেওয়া। সুশীল সমাজের অনেক সংগঠন জানিয়েছে, করোনা মহামারী চলাকালীন অনলাইন স্কুলের সুবিধা নেওয়ার জন্য স্কুল-বয়সী শিশুদের অনেক পরিবার ইন্টারনেটের সুযোগ পেতে হিমশিম খেয়েছে।

**শিশু নির্যাতন:** যৌন নির্যাতন, শারীরিক ও অপমানজনক শাস্তি, শিশুকে পরিত্যাগ, অপহরণ এবং পাচারসহ অনেক ধরনের শিশু নির্যাতন গুরুতর এবং ব্যাপকভাবে অব্যাহত রয়েছে।শিশুরা বাড়ি, এলাকা, স্কুল, আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্র সব জায়গায়ই নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঝুঁকির মুখে ছিল। প্রচলিত আইনে শিশু নির্যাতন এবং অবহেলা নিষিদ্ধ, অন্যথায় পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা বা উভয় শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। শিশু অধিকার সংক্রান্ত এনজিওগুলোর নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) এর তথ্য অনুযায়ী আইনটি পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। এছাড়া শিশু-কিশোরদের মামলাগুলো আরো অসংখ্য ফৌজদারি মামলার মতোই অনেক সময় বিচারজটে আটকা পড়ে পিছিয়ে যায়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজ সেবা অধিদপ্তর সহিংসতা, নির্যাতন এবং শোষণের সম্মুখীন

শিশুদের সাহায্য করার লক্ষ্যে বিনামূল্যের টেলিফোন সেবা ‘চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮’ পরিচালনা করে। । হটলাইনটি বছরে গড়ে প্রায় আশি হাজার কল পেয়েছে, দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকেইযোগাযোগ করা যায়। হটলাইনটি উদ্ধার, সুপারিশএবং কাউন্সেলিংয়ের মতো বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকে।

আসক জানিয়েছে, বছরের প্রথমার্ধে শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার মোট ৪৫৩টি মামলা হয়েছে।

অধিকার জানিয়েছে, এ বছর শিশু ধর্ষণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। এক জরিপে দেখা গিয়েছে, চট্টগ্রামে ধর্ষণের শিকার ভুক্তভোগীদের মধ্যে ৬৪ শতাংশ হচ্ছে শিশু-কিশোর।

শিশু ধর্ষণের ওপর বিএসএএফ এর ২০১৯ সালের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ধর্ষণের শিকারদের মধ্যে ছিল দুই বছরের কম বয়সী শিশুও এবং  এতে শিশু ধর্ষণ বৃদ্ধির কারণ হিসাবে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিএসএএফ-এর ২০২০ সালের রিপোর্টে দেশীয় সংগঠন হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি জানিয়েছে, ৮৫০টি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে এবং শিশুদের বিরুদ্ধে ১৩৬টি সহিংস ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

বছরজুড়ে বিভিন্ন মাদ্রাসার সাবেক শিক্ষার্থীরা শিক্ষক ও বয়সে বড় ছাত্রদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের নানা অভিযোগ তোলে । মে মাসে সাবেক এক ছাত্রলীগ নেতা নবম শ্রেণির এক মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষণ করেন। পরে পরিবারের সদস্যরা গুরুতর অবস্থায় মেয়েটিকে উদ্ধার করে। মেয়েটির বাবা বিচার দাবি করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাকে মারধর করেন।সেপ্টেম্বরে কক্সবাজারে নয় বছর বয়সী একটি মেয়ের বাবা স্থানীয় মাদ্রাসা শিক্ষকের বিরুদ্ধে তারমেয়েকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ভেতরে ধর্ষণের অভিযোগ করেন। অনেক তুলনামূলকভাবে ছোট স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প এবং গভর্নিং বডির থেকে কোনো তদারকিও ছিল না।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মনিটরিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠাসহ কিছু অগ্রগতি সত্ত্বেও শিশু পাচার,পাচার থেকে বেঁচে যাওয়া শিশুদের যত্ন এবং সুরক্ষার ক্ষেত্রেও সমস্যা অব্যাহত রয়েছে। কিছু শিল্পে শিশুশ্রম ও কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের মতোসমস্যা রয়ে গেছে যার বেশিরভাগই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। এ ছাড়া শিশু গৃহকর্মীরা অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে।

**বাল্য, অল্পবয়সী এবং জোরপূর্বক বিবাহ**

বিয়ের বৈধ বয়স নারীদের জন্য ১৮ এবং পুরুষদের জন্য ২১। তবে আইনে "বিশেষ পরিস্থিতিতে" যেকোনো বয়সে নারী ও পুরুষের বিয়ের বিধান রয়েছে। ২০২০ সালের একটি প্রতিবেদনে ইউনিসেফ জানিয়েছে, ৫১ শতাংশ নারীর বিয়ে হয়েছে ১৮ বছর বয়সের আগে, যা ২০১৮ সালের রিপোর্টে ৫৯ শতাংশ ছিল।

২৬ জুন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, শাহিন হাওলাদার নামে ৬০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি (তিনি কনকদিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ক্ষমতাসীন দলের সদস্য) ১৪ বছর বয়সী এক মেয়েকে বিয়ে করেছেন। মেয়েটি তার ১৯ বছর বয়সী প্রেমিককে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করায় ওই চেয়ারম্যান সালিশ করেছিলেন। শাহিন হাওলাদার ইতিমধ্যে বিবাহিত ও দুই সন্তানের বাবা ছিলেন। চেয়ারম্যান কাগজপত্র দেখিয়েছিলেন যে মেয়েটির বয়স ১৮। তবে ২৮ জুন তিনি মেয়েটিকে তালাক দিয়ে তার বাবার কাছে হস্তান্তর করেন। অপ্রাপ্তবয়সী মেয়েকে জোর করে বিয়ে করার অভিযোগে ২৯শে জুন শাহিন হাওলাদারসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা হয় । পুলিশকে মামলাটি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। একটি আদালত হাওলাদারকে চেয়ারম্যান পদ থেকে বরখাস্ত করে, তবে আপিলের পর সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়।

বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিয়ে কমাতে সরকার বাধ্যতামূলক পঞ্চম শ্রেণির পরও স্কুলের খরচ মেটাতে মেয়েদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। সরকার ও এনজিওগুলো অভিভাবকদের মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য ১৮ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার গুরুত্ব বোঝাতে কর্মশালা এবং বিভিন্ন জনসম্পৃক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সরকার সারা দেশে ৪ হাজার ৮শ টি ক্লাবও চালু করেছে এবং দেড় লাখের বেশি কিশোর-কিশোরী এর সঙ্গে যুক্ত।

প্রতিটি ক্লাবে প্রায় ২০টি মেয়ে ও ১০টি ছেলে অন্তর্ভুক্ত,  যারা তাদের নিজেদের ক্ষমতায়ন প্রকল্পে একসঙ্গে কাজ করেছে। এ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শিক্ষাবিষয়ক সচেতনতা, অ্যাডভোকেসি এবং জীবন পরিচালনার কাজের দক্ষতার প্রশিক্ষণ।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী বাল্যবিবাহের অভিযোগ জানানো এবং অন্যান্য সেবার জন্য দুটি মোবাইলভিত্তিক সেবা রয়েছে: জয়া অ্যাপ এবং ১০৯ হটলাইন। মন্ত্রণালয়ের মতে, প্রতিদিন এক হাজারেরও বেশি নারী এ হটলাইনটি ব্যবহার করেছে।

সুশীল সমাজের অনেক সংগঠন করোনা অতিমারীর কারণে দীর্ঘসময় স্কুল বন্ধ থাকা এবং স্কুল ঝরে পড়া ও বাল্য বিবাহের ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার মধ্যে কার্যকারণ

সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছে। এসব সংগঠনের তথ্যমতে, অতিমারীজনিত কারণে ২০২০ সালে বাল্য বিবাহ ১৩ শতাংশ বেড়েছে।

২৯শে জুলাই আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় সহযোগীদের সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কর্মসূচি' শীর্ষক কার্যক্রম শুরু করে। এর উদ্দেশ্য, পরিবারগুলোকে ক্ষতিকর প্রথা বাল্যবিবাহ পরিত্যাগে উৎসাহিত করা এবং বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য সরকারের ১০ বছর মেয়াদি (২০১৮-২০৩০) জাতীয় কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে সহায়তা করা। এই কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে 'বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য এক মিলিয়ন প্রতিশ্রুতি," শীর্ষক একটি অঙ্গীকার অভিযান। এ অভিযানের লক্ষ্য হচ্ছে এলাকাবাসীর সম্পৃক্ততা, সক্ষমতা বিকাশ, গণমাধ্যমকে কাজে লাগানো ও প্রচারণা।

## শিশুদের ওপর যৌন শোষণ

শিশুদের ওপর যৌন শোষণের শাস্তি ১০ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। শিশু পর্নোগ্রাফি এবং এই ধরনের উপাদান বিক্রি বা বিতরণ নিষিদ্ধ। এনজিও টেরে ডেস হোমস-নেদারল্যান্ডস এর ২০১৯ সালের একটি রিপোর্ট বলেছে, পথশিশুরা যৌন অপরাধের জন্য সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু সামাজিক ও আর্থিক সহায়তার অভাব এবং দীর্ঘ ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার কারণে তাদের জন্য আইনি প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ নগণ্য। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকার বাণিজ্যিক যৌন শোষণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে শিশুরা একাধিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, ঢাকার রাস্তায় বসবাসরত মেয়ে শিশুদের ৭৫ শতাংশ যৌন শোষণের ঝুঁকিতে রয়েছে, আনুমানিক ৩০ হাজার মেয়ে শিশু যৌন শোষণের শিকার হচ্ছে। বিভিন্ন সংগঠনের সহায়তার মাধ্যমে সরকার আনুমানিক ১৫ লাখ পথশিশুর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করেছে এবং তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আশ্রয় এবং নিরাপদ কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়েছে।

পতিতালয়ে পাচার করা কমবয়সী মেয়েরা তাদের বয়স ১৮ বছরের বেশি হিসেবে উল্লেখিত নোটারীকৃত সার্টিফিকেট তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। কিছু এনজিওর অভিযোগ, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মচারি ও আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা এসব অপরাধ সংগঠিত হতেদিয়েছেন বা এতে সহায়তা করেছেন৷ আন্তঃসীমান্ত পাচার ছাড়াও পাচারকারীরা সারা দেশ থেকে মেয়েদের

প্রলুব্ধ করে বৈধ ও অবৈধ পতিতালয় এবং হোটেলে বাণিজ্যিক যৌন শোষণমূলক কাজে নিয়োজিত করে।

**বাস্তুচ্যুত শিশু:** অধ্যায় ২.চ দ্রষ্টব্য।

## আন্তর্জাতিক শিশু অপহরণ

বাংলাদেশ ১৯৮০ সালের আন্তর্জাতিক শিশু অপহরণের সিভিল দিক সম্পর্কিত হেগ কনভেনশন- এর স্বাক্ষরকারী নয়।

আন্তর্জাতিকভাবে পিতামাতা কর্তৃক শিশু অপহরণ বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন দেখুন:

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html.

## ইহুদি বিদ্বেষ

বাংলাদেশে কোনো ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল না। রাজনীতিবিদ ও ইমামরা ইহুদিবিরোধী কথাবার্তা বলে থাকেন, বলা হয়, জনসমর্থন পাওয়ার আশায় তারা এটা করে থাকেন।

## মানবপাচার

মানবপাচার বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিবেদন দেখুন:

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.

## প্রতিবন্ধী ব্যক্তি

আইন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমান আচরণ পাওয়ার এবং বৈষম্য থেকে মুক্ত থাকার অধিকার দিয়েছে, এবং সরকার এই বিধানসমূহ কার্যকর করার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।এনজিওগুলো বলেছে, সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যজনিত সহিংসতার ঘটনাগুলোকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছেএবং প্রতিবন্ধীদের উপর সহিংসতা ও নির্যাতনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিষয়ে তদন্ত ও শাস্তি দেওয়ার জন্য কাজ করেছে। তবে সুশীল সমাজের ভাষ্য, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাই মহামারির সময় জুড়ে ছিল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী ও কমবয়সী মেয়েরা।

৭,০০০ এরও বেশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়তা প্রদানকারী স্থানীয় এনজিও, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থার (বিপিইউএস) নির্বাহী পরিচালক বদিউল আলম বলেছেন, বাংলাদেশের আনুমানিক দেড় থেকে ২ কোটি মানুষ

(জনসংখ্যার ১০ শতাংশ) কোনো না কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত। বিপিইউএস এর অনুমান, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ৬০ শতাংশেরও বেশি গ্রামীণ এলাকায় বাস করে যেখানে সরকারি সহায়তা পাওয়ার সুযোগ নেই।

২০২০ সালে সরকার জাতীয় ভবন নির্মাণ আইন পাস করে। আইনে ভৌত অবকাঠামো প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী করার কথা বলা হলেও সরকার তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করেনি। উদাহরণস্বরূপ, সরকারি ভবনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। আইনটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় কমিটি গঠনের কথা বলা হলেও অধিকাংশ কমিটিই সক্রিয় হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীনে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল না।

আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং চাকরির সুযোগ পেতে পরিচয়পত্রের জন্য নিবন্ধন করার কথা বলা হয়েছে। এই নিবন্ধন তাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া, ভোট দেওয়া এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেবে।আইনে বলা হয়েছে কোনো ব্যক্তি, সংগঠন, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য করবে না। প্রতিবন্ধিতার কারণে স্কুলের শিক্ষা, কাজ বা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে অসম আচরণ করার অপরাধ প্রমাণিত হলে এতে জরিমানা বা তিন বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে তবে আইনের প্রয়োগ সুষম হয়নি। স্থানীয় এনজিওগুলোর অনুমান, প্রতিবন্ধীদের মধ্যে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি, কারণ ভোট কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সুব্যবস্থা ছিল না। বেশিরভাগ ভোটকেন্দ্রেই প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভোট দেওয়ার সুযোগ ছিল না, যেমন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গোপনীয়তা রক্ষা করে ভোট দেওয়ার জন্য ব্রেইল ব্যালটের মতো কোনও সহায়ক সরঞ্জাম ছিল না।

আইনটির উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ২৭-সদস্যের একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটিকে সব সরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম সমন্বয় করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আইনের বাস্তবায়নের ধীর গতির , কারণে আইনে উল্লিখিত প্রতিবন্ধী অধিকার এবং সুরক্ষা কমিটির  গঠন ও কার্যক্রম বিলম্বিত হয়েছে। নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো জাতীয় সংসদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে তাগিদ দিয়েছে। তারা সংসদে প্রতিবন্ধীদের প্রতিনিধিত্বের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেছেন, এতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তাদের প্রয়োজনগুলো বিবেচনায় নেওয়া নিশ্চিত হবে।

অ্যাকশন এগেইনস্ট ডিজ্যাবিলিটি নামক এনজিওটির তথ্য অনুযায়ী কিছু প্রতিবন্ধী শিশু বিশেষ সহায়ক ব্যবস্থা না থাকায় সরকারি স্কুলে যায়নি, তবে এ

বিষয়ক তথ্য সহজলভ্য নয়। সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ওপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং জেলা পর্যায় প্রতিবন্ধী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তিও বরাদ্দ করেছে। ২০২০ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, প্রতিবন্ধী শিশু থাকা অনেক পরিবারেরই সরকারি কর্মসূচি এবং সুযোগ-সুবিধাগুলো সম্পর্কে ধারণা বা সেগুলো পাওয়ার সুযোগের অভাব রয়েছে।

আইন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্য ব্যক্তিদের  মতোই একইরকম তথ্য পাওয়ার অধিকার দিয়েছে, তবে এই অধিকারসমূহের  প্রয়োগ প্রায়শই নির্ভর করে পরিবার এবং স্থানীয় সামাজিক পরিবেশের উপর । এছাড়া অনেক সংগঠন জানিয়েছে যে, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা প্রযুক্তির সুযোগ নিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। এতে তারা শিক্ষা, তথ্য, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য মৌলিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ।

অনেকে বলেছেন সরকারি ওয়েবসাইটগুলোতে এখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আরও ব্যবহারকারী-বান্ধব পরিসেবা রয়েছে। তারা আবার এটাও জানিয়েছেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য তথ্য সাধারণত স্ক্যান করা নথি হিসাবে পোর্টালগুলিতে আপলোড করা হয়, যা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ব্যবহার করা সফটওয়্যারের জন্য বেমানান। প্রতিবন্ধী সম্প্রদায়ের সদস্যরা বলেছেন, সহায়ক প্রযুক্তি দিয়ে পড়া যায় এমন ফরম্যাটে নথিপত্র আপলোড করা হলে তা ইতিবাচক অবদান রাখবে। সরকার প্রতি বছর দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্যবহারযোগ্য বই সরবরাহ করেছে। এছাড়া সরকার একটি জাতীয় ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছে সমস্ত সরকারি পরিসেবা উপযোগী ফরম্যাটে তুলে দেওয়ার জন্য একটি জাতীয় ওয়েব অ্যাক্সেসিবিলিটি নির্দেশিকা নিয়ে কাজ  করছে।

আইনটি সরকারি আইনি পরিসেবার জন্য একটি অগ্রাধিকার পাওয়া গোষ্ঠী হিসাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করেছে৷ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থাগুলো হচ্ছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর দ্য ডেভলেপমেন্ট অব ডিজ্যাবল্ড। আন্দোলনকর্মীরা বলেছেন, প্রতিবন্ধী নারী ও কমবয়সী মেয়েদের অধিকার নিশ্চিত করার সরকারি কর্মপরিকল্পনাকে আরো শক্তিশালী করা দরকার।

সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওপর সহিংসতা ও নির্যাতনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে। এছাড়া জাতীয় হেল্পলাইনকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অভিগম্য করার পরিকল্পনা করেছে।

মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা অপর্যাপ্ত।স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্নায়বিক সমস্যা মূল্যায়নের জন্য সব সরকারি মেডিকেল কলেজে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও বৃত্তিমূলক পুনর্বাসনের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের জন্য বেশ কয়েকটি ব্যক্তিগত উদ্যোগ বিদ্যমান ছিল। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন সেবা দিয়েছে ও তাদের সমর্থনে কথা বলেছে। সরকার দেশের ৬৪টি জেলার সবগুলোতে ১০৩টি প্রতিবন্ধী তথ্য ও সেবা কেন্দ্র পরিচালনা করে যেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে পুনর্বাসন সেবা এবং সহায়ক যন্ত্রাদি  সরবরাহ করেছে ।

সরকার অটিজম বিষয়ক গবেষণা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে । সরকার প্রতিবন্ধীভাতাসহ সামাজিক সুরক্ষা ভাতা প্রদানের জন্য একটি ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা চালু করেছে। অ্যাক্টিভিস্টরা জানিয়েছেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মাসিক সরকারি ভাতা ৭৭৫ টাকা (নয় ডলার) এবং তারা সরকারকে জাতীয় বাজেটে এ ভাতা বাড়ানোর কথা বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছেন। সরকারের  নিষ্ক্রিয়তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোটাধিকার প্রয়োগসহ, নাগরিক জীবনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অধিকারকে সীমিত করেছে।

## এইচআইভি এবং এইডসসামাজিক কলঙ্ক

সামাজিক সংগঠনসমূহ এবং এলজিবিটিকিউআই+ অ্যাক্টিভিস্টরা অনেক সময়ই এইচআইভি-এইডস ও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর উপর বিদ্যমান সামাজিক কলঙ্ককে স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে উল্লেখ করে, বিশেষ করে  ট্র্যান্সজেন্ডার সম্প্রদায় এবং সমকামী পুরুষদের জন্য। মানসিক স্বাস্থ্যসেবা ছিল একটি বড় উদ্বেগের বিষয় এবং এই গোষ্ঠীগুলোর মতে, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের মধ্যে এলজিবিটিকিউআই+ ব্যক্তিদের কাছে নৈতিকতামূলক পরিভাষা ব্যবহার করে লজ্জা দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। শারীরিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে, অনেক স্বাস্থ্যকর্মী যৌন কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনায় অস্বস্তি প্রকাশ করেছেন, এবং  যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে সংক্রমিত অসুখের কথা বলার সময় রোগীদের লজ্জা দিয়েছেন।যৌনতার সময় এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ করা প্রিইপি বা পিইপিএবং এক্সপোজার পূর্ববর্তি ও পরবর্তি ওষুধের কোনোটাই এদেশে উপলব্ধ ছিল না। সরকার বিনামূল্যে এইচআইভি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে,  কিন্তু পরীক্ষা এবং চিকিৎসার বিষয়ে জোরালো কলঙ্কের মানসিকতা রয়ে গেছে। ১৯ অক্টোবর সরকার সারা দেশে চিকিৎসার সুবিধা বাড়ানোর প্রচেষ্টার রূপরেখা দিতে জাতীয় অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি নির্দেশিকা প্রকাশ করে।

## যৌন অভ্যাস এবং লৈঙ্গিক পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে সহিংসতা, অপরাধীকরণ এবং অন্যান্য অন্যায় আচরণ

দেশের দণ্ডবিধিতে সমকামিতা বেআইনি। তবে সরকার সক্রিয়ভাবে এ আইন প্রয়োগ করেনি। এলজিবিটিকিউআই+ সংগঠনগুলো বলেছে, সরকার সামাজিক চাপের কারণে আইনটি বহাল রেখেছে।

এলজিবিটিকিউআই+সংগঠনগুলো বলেছে, এলজিবিটিকিউআই+ ব্যক্তি এবং যাদের যৌন প্রবণতা নির্বিশেষে  এলজিবিটিকিউআই+ হিসেবে ধারণা করা  হয় এমন ব্যক্তিদের হয়রানি করার অজুহাত হিসাবে পুলিশ আইনটি ব্যবহার করেছে, একইসঙ্গে এলজিবিটিকিউআই+সংগঠনগুলোর নিবন্ধন সীমিত করাও এর লক্ষ্য।  কিছু সংগঠন সন্দেহজনক আচরণ সংক্রান্ত আইনের আওতায় হয়রানির কথাও জানিয়েছে।  ট্র্যান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠী  দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক হলেও সমাজের অংশ হিসেবেই স্বীকৃত। তা সত্ত্বেও সহিংস চরমপন্থী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে তারা অব্যাহতভাবে উচ্চ মাত্রার ভয়, হয়রানি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পক্ষ থেকে যোগাযোগের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে।এলজিবিটিকিউআই+ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বা অপরাধে জড়িতদের বিষয়ে পুলিশী তদন্ত এবং বিচার বিরল ঘটনাই থেকে গেছে।

এলজিবিটিকিউআই+ সম্প্রদায়ের সদস্যরা টেলিফোন, টেক্সট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে হুমকিমূলক বার্তা পেয়েছেন এবং কেউ কেউ পুলিশী হয়রানির শিকার হয়েছেন৷ শারীরিক সহিংসতার অব্যাহত হুমকির কারণে তারা অনলাইন এবং শারীরিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। আগস্টে একটি সন্ত্রাস বিরোধী ট্রাইব্যুনাল পাঁচ বছর আগে দুই সমকামী পুরুষ, দেশের প্রথম সমকামী অধিকার ম্যাগাজিনের সম্পাদক মাহবুব রাব্বি তনয় ও সমকামী অধিকার কর্মী জুলহাজ মান্নানকে হত্যার ঘটনায় ছয়জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে।

দেশের আইনে আবাসন, কর্মসংস্থান, জাতীয়তা আইন এবং স্বাস্থ্য পরিসেবার মতো সরকারি সেবার সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে এলজিবিটিকিউআই+ ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। এলজিবিটিকিউআই+ সংগঠনগুলো কর্মসংস্থান, পেশা ও আবাসন এবং স্বাস্থ্যসেবা এবং ন্যায়বিচারের সুযোগসহ সরকারি সেবাগুলো পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্যের কথা জানিয়েছে।

দেশের কিছু ট্র্যান্সজেন্ডার নারী হিজরা উপসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ বা বাড়তি সামাজিক সুরক্ষা পাওয়ার আশায় নিজেদের হিজরা হিসেবে চিহ্নিত করলেও সবাই তা করে না। অনেক ট্র্যান্সজেন্ডার নারী তাদের ট্র্যান্সজেন্ডার পরিচয়টি

জোরের সঙ্গে নিশ্চিত করেছেন এবং যারা তাদের হিজড়া হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তাদের শুধরে দিয়েছেন। অন্যদিকে ট্র্যান্সজেন্ডার পুরুষরা সমর্থন বা সহনশীলতা পান না বললেই চলে, বিশেষ করে দরিদ্র এবং গ্রামীণ সম্প্রদায়ে। কিছু রক্ষণশীল ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ট্র্যান্সজেন্ডারদের নিন্দা করেছেন, তারা হিজড়াদের চেয়ে এদের স্পষ্টভাবে পৃথক করে দেখিয়েছেন। তাদের বক্তব্য হিজড়ারা সহনীয় কিন্তু ট্র্যান্সজেন্ডাররা অগ্রহণযোগ্য।

বিশেষভাবে লেসবিয়ানদের (নারী সমকামী) সাহায্য করে এমন সংগঠন এখনো বিরলই রয়ে গেছে। যৌন অভিমুখতার উপর ভিত্তি করে সামাজিক কলঙ্ক বহুল প্রচলিত বিষয় এবং এ বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা নিবৃত করাহয়।

সমাজের ক্ষুদ্র অংশ হিজড়া সম্প্রদায়ের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরিতে সরকার কিছুটা অগ্রগতি করতে পারলেও এলজিবিটিকিউ+ সম্প্রদায়ের অন্যদের অধিকার এগিয়ে নিতে তেমন প্রচেষ্টা চালায়নি। ১৬ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক ঘোষণা দেন জাতীয় আদমশুমারিতে হিজড়াদের "তৃতীয় লিঙ্গ" হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে; পরবর্তী আদমশুমারি ২০২২ সালে হওয়ার কথা।

## সমাজে অন্যান্য সহিংসতা বা বৈষম্য

অবৈধ ফতোয়া জারি ও গ্রাম্য সালিশ এর মত ঘটনাও বিদ্যমান ছিল। স্থানীয় একটি বড় এনজিওর ভাষায় ধর্মবেত্তাদের পরিবর্তে এগুলো প্রদান করেনএলাকার নেতারা।

অধ্যায় ৭. শ্রমিকের অধিকার

## ক. সংগঠনের স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার

আইনে ইউনিয়নে যোগদানের অধিকার এবং সরকারি অনুমোদন নিয়ে ইউনিয়ন গঠনের অধিকার রয়েছে। তবে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অনেক প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হওয়া এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল হওয়ার ব্যাপারে শ্রমিক অধিকার সংগঠনগুলোর অভিযোগ রয়েছে।

আইন অনুসারে, একটি প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রমশক্তির কমপক্ষে ২০ শতাংশ সদস্য হওয়ার জন্য রাজি থাকলে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ শ্রম অধিদপ্তর ইউনিয়নটির নিবন্ধন অনুমোদন করবে। সদস্য ২০ শতাংশের নিচে নেমে গেলে শ্রম অধিদপ্তর শ্রম আদালতকে কোনো ইউনিয়ন বাতিল করে দেওয়ার অনুরোধ জানাতে পারবে। সাধারণত আইনটি ‘ওয়াল টু ওয়াল’ (পুরো কারখানা) ইউনিয়নের অনুমোদন দিয়ে থাকে। এনজিওগুলোর অভিযোগ, ট্রেড

ইউনিয়ন নিবন্ধক প্রায়শই নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার অপব্যবহার করেন এবং কোনো কারণ ছাড়াই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন বা এমন কিছু কারণ দেখান যা আইন বা নীতিমালায় স্বীকৃত নয় বা আবেদনে ভিত্তিহীন ত্রুটি তুলে ধরেন। একটি ইউনিয়নের প্রতিনিধি জানান, তিনি ইউনিয়ন গঠনের সব কাগজপত্র তৈরি করেছিলেন এবং ৩০ শতাংশ শ্রমিকদের সমর্থনও ছিল, কিন্তু শ্রম অধিদপ্তর ইউনিয়ন নিবন্ধন দেয়নি, কারণ কারখানার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, তাদের আরও শত শত বাড়তি শ্রমিকরয়েছে। সংগঠকদের নাম কারখানার মালিককে জানিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেককেই চাকরি হারাতে হয়। এ ছাড়াও শ্রম অধিদপ্তর প্রতি গার্মেন্ট কারখানার জন্য একের বেশি ইউনিয়নের অনুমোদন দেয়নি। শ্রমিক নেতারা জানিয়েছেন, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতি নমনীয় ইউনিয়নগুলো দ্রুত সংগঠিতকরণের অনুমোদন পেয়েছে ।

শ্রম আইনে শ্রমিকের সংজ্ঞায় ব্যবস্থাপক, তত্ত্বাবধায়ক, এবং প্রশাসনিক কর্মীকে রাখা হয়নি। অগ্নিনির্বাপণ কর্মী, নিরাপত্তা রক্ষী এবং নিয়োগদাতার ব্যক্তিগত সহকারীদেরও ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার অধিকার নেই। সিভিল সার্ভিস ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদেরও ইউনিয়ন গঠনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ।

আইনটি রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা(ইপিজেড) এর প্রায় ৪,৩০,০০০ শ্রমিকের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন করা অব্যাহতভাবে নিষিদ্ধ রেখেছে এবং তাদের সংগঠন করা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকারকে মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ করেছে। ইপিজেড-এ স্বাধীন, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ইউনিয়নের কার্যক্রমের বদলে রয়েছে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) দ্বারা প্রভাবিত শ্রমিক কল্যাণ সমিতি (ডব্লিউডব্লিউএ)। আইন সেখানে কারখানা পরিদর্শনকে সীমিত করেছে এবং ধর্মঘটের অধিকারকে ব্যাপকভাবে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। আইনে বেপজার সভাপতিকে 'জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর' বিবেচিত যে কোনো ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আইনে ইপিজেড শ্রম ট্রাইব্যুনাল, আপিল ট্রাইব্যুনাল এবং সালিসীর bবিধান থাকলেও এসবের কোনোটিই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর বদলে আটটি শ্রম আদালত এবং একটি আপিল শ্রম আদালতে ইপিজেডের কারখানার মামলার শুনানি হয়ে থাকে। কোনো ফেডারেশন করতে হলে অবশ্যই ইপিজেড-এর একটি জোনের শ্রমিক কল্যাণ সমিতির ৫০ শতাংশের বেশি সদস্যের অনুমোদন নিতে হবে। বাইরের রাজনৈতিক দল, ইউনিয়ন, ফেডারেশন বা এনজিও-র সঙ্গে কোনো সংযোগ গড়ে তোলা নিষেধ। শুধু ইপিজেড-এ সংগঠনের অধিকার ও শ্রমিক সুরক্ষার ব্যাপারে সীমাবদ্ধতাটুকু ছাড়া শ্রম আইন ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছে। শ্রম আদালত চাইলে ইউনিয়ন কার্যক্রমের জন্য চাকরিচ্যুত

শ্রমিকদের পুনর্বহালের আদেশ দিতে পারে, তবে পুনর্বহালের আদেশ খুব কমই দেওয়া হয়েছে।

শ্রম আদালতের অনুমোদন নিয়ে অন্যান্য কারণেও ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিল করতে পারে শ্রম অধিদপ্তর। ইউনিয়ন বিলুপ্তি বা নিবন্ধীকরণে অস্বীকারের ক্ষেত্রে আপিল আবেদনের অধিকার দেওয়া হয়েছে আইনে। এতে ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্যসহ অন্যায্য শ্রম অনুশীলনগুলো স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ, তবে ২০১৮ সালের শ্রম আইন সংশোধনীতে নিয়োগদাতা ও শ্রমিক উভয় পক্ষের জন্যই জরিমানা অর্ধেক করে দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কাছে সরকারের জমা দেওয়া রোডম্যাপের নির্দেশনা অনুসারে শ্রম আইন ও বিধি সংশোধনের প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। শ্রমিকদেরকে প্রায়ই অন্যায্য শ্রম অনুশীলনের জন্য অভিযুক্ত করা হলেও; নিয়োগদাতাদের প্রতি এমন অভিযোগ খুব কমই আনা হয়েছে। প্রযোজ্য আইনগুলো কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেনি সরকার। এর শাস্তিগুলোও নাগরিক অধিকার অস্বীকার-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। আইনটিতে বৈধ ধর্মঘট পরিচালনার অধিকার থাকলেও তাতে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন, 'সমাজের জন্য গুরুতর সমস্যা' বলে মনে করলে সরকার ধর্মঘট নিষিদ্ধ করতে পারবে। ৩০ দিনের চেয়ে বেশি সময় ধরে চলমান যে কোনো ধর্মঘট বন্ধ করতে পারবে। এ ছাড়া কারখানা বিদেশি বিনিয়োগে তৈরি হলে বা বিদেশি বিনিয়োগকারীর মালিকানাধীন হলে বাণিজ্যিক উৎপাদনের প্রথম তিন বছরে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা হয়েছে আইনে।

আইনে শ্রম আদালতের মাধ্যমে সমঝোতা, সালিশ এবং বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। শ্রম সংক্রান্ত অনিয়ম দেখাশোনার ক্ষমতা শ্রম অধিদপ্তরের। আর মজুরি সংক্রান্ত বিরোধের মধ্যস্থতা করার ক্ষমতা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের হাতে, কিন্তু এদের সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক নয়। সরকার জানিয়েছে, শ্রম সংক্রান্ত অনিয়মের জন্য জানুয়ারি থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২০টি অভিযোগ দায়ের হয়েছিল; ছয়টি আইন ও স্বীকৃত পরিচালন পদ্ধতি (এসওপি) অনুসারে সমাধান করা হয়েছে, চারটির তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং ১০টি চলমান ছিল। ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনগুলো জানিয়েছে, শ্রম আদালতে আগে থেকেই প্রচুর মামলা জমে থাকার কারণে তারা নতুন শ্রম বিষয়ক অনিয়মের মামলা দায়ের করা বন্ধ করে দিয়েছে।

ইউনিয়নের শ্রমিকরা কোনো কারণে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে আইনে তাদের ধর্মঘট করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তবে খুব কম ধর্মঘটের ক্ষেত্রেই জটিল আইনি শর্ত অনুসরণ করা হয়। ধর্মঘট বা কাজ

থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনা অনেক সময়ই ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আইন অনুসারে, ইউনিয়নের অন্তত ৭৫ শতাংশ কর্মীর ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন থাকতে হবে। বছর জুড়ে বেশ কিছু খাতে কর্ম বিরতি, ধর্মঘট, এবং কর্মক্ষেত্রের অন্যান্য কর্মসূচি ছিল। এগুলো সাধারণত হয়েছে বকেয়া মজুরি, অবৈধভাবে কারখানা বন্ধ রাখা, ছাঁটাই, লেঅফ এবং বৈষম্যের কারণে । কোভিড-১৯ মহামারী এই সমস্যাগুলোকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

জুলাই মাসে গাজীপুরের স্টাইল ক্রাফট কারখানার শ্রমিকরা বকেয়ার দাবিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ভবনের সামনে ১০ দিন ধরে বিক্ষোভ করে। ওই সময়ে নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে শ্রম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বারবার বৈঠক হওয়া সত্ত্বেও বকেয়া পরিশোধ প্রশ্নে কোনো অগ্রগতি হয়নি। শিল্প পুলিশের তথ্যানুসারে, কারখানাটিতে ৩,২০০ শ্রমিক ছিলেন। কারখানার কার্যক্রম হুট করে বন্ধ করে দেওয়ার পর তাদের মজুরি বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। শ্রমিকরা জানিয়েছিলেন, তাদের মজুরি চার থেকে নয় মাস যাবত বকেয়া ছিল যার মোট অঙ্ক ৭০ কোটি টাকার বেশি (৮.১৪ মিলিয়ন ডলার)। তবে কারখানার মালিক আড়াই কোটি টাকারও কম (২,৯০,৬৯৮ ডলার) দিতে রাজি হয়েছিলেন।

১৩ জুন ঢাকা ইপিজেডের সামনে বকেয়া বেতনের দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভরত ৫০০-৬০০ শ্রমিকের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে। এতে পোশাক কারখানার নারী শ্রমিক জেসমিন বেগম মারা যান এবং ৩৫ জন আহত হন। স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নের এক নেতার তথ্যানুসারে, লেনি ফ্যাশনস লিমিটেড, লেনি অ্যাপারেলস লিমিটেড এবং এ ওয়ান ফ্যাশনস লিমিটেডের কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট ছোড়ার পাশাপাশি লাঠিচার্জ করে ও জলকামান ব্যবহার করে। বিপরীতে শ্রমিকদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পুলিশের দিকে ইটপাটকেল ছোঁড়ে। ইউনিয়নের নেতারা বলছেন, জেসমিন বেগম পুলিশের রাবার বুলেটের আঘাতে মারা গেছেন। তবে পুলিশের দাবি, সংঘর্ষের সময় পালাতে গিয়ে খুঁটিতে ধাক্কা লেগে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন জেসমিন। অভিযোগ রয়েছে, উল্লিখিত তিনটি কারখানা শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ না করেই জানুয়ারি মাসে কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। তারপরে সাবেক শ্রমিকরা বিক্ষোভ করতে মাঠে নামে। ঢাকা ইপিজেড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধের জন্য তারা বন্ধ কারখানাগুলো বিক্রি করার চেষ্টা করছে।

১৭ এপ্রিল, গণমাধ্যমের প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, চীনা সহায়তাপুষ্ট একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে বকেয়া মজুরি শোধ এবং বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর গুলি চালায় পুলিশ। এতে কমপক্ষে সাতজন শ্রমিক নিহত ও

বেশ কয়েকজন আহত হয়। চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রটির নির্মাণস্থলে আনুমানিক ২,০০০ বিক্ষোভকারী ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করলে পুলিশ এক পর্যায়ে গুলি চালায়। শ্রমিকরা বকেয়া মজুরি শোধ, বেতন বৃদ্ধি এবং রমজান মাসে কর্মঘণ্টা হ্রাসের দাবিতে প্রতিবাদ করছিলেন যা ঐ একই সপ্তাহে শুরু হয়েছিল।

শ্রমিক অধিকার সংগঠন সলিডারিটি সেন্টারের তথ্যানুসারে, ২০১৩ সাল থেকেই ইউনিয়ন নিবন্ধন আবেদন এবং অনুমোদন দুটিই উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। শ্রমিকরা ইউনিয়ন নিবন্ধন করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। ২০১৭ সালে ইউনিয়ন নিবন্ধনের জন্য স্বীকৃত পরিচালন পদ্ধতি (এসওপি) গ্রহণ করা সত্ত্বেও প্রক্রিয়াটির জন্য নিয়মিতভাবেই ৬০-দিনের সর্বোচ্চ সময়ের চেয়েও বেশি সময় লাগছে বলেই জানিয়েছে সলিডারিটি সেন্টার। তারা আরো জানিয়েছে, সব ইউনিয়ন আবেদনের প্রায় অর্ধেকই যথেচ্ছা প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। জানুয়ারি থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সলিডারিটি সেন্টারের অংশীদাররা ১০টি ইউনিয়নকে তাদের রেজিস্ট্রেশনে সহায়তা করেছেএবং শুধু একটি অনুমোদিত হয়েছে, তিনটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং ছয়টি অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল। সরকার জানিয়েছে, সারা বছরে ২৩৩টি বৈধ আবেদন এসেছে, ১৯০টি অনুমোদিত হয়েছে, ৩১টি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, বাকিগুলো পর্যালোচনাধীন ছিল।

তৈরি পোশাক খাতের (আরএমজি) শ্রমিকরা ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা ও সম্মিলিত দরকষাকষির ক্ষেত্রে  বাধার সম্মুখীন হওয়ার কথা জানিয়েছেন । স্থানীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ক 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ' (সিপিডি) -এর ২০১৮ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, ৩৬ লাখ শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া ৩,৮৫৬টি আরএমজি কারখানার মধ্যে ৯৭.৫ শতাংশেই কোনো ইউনিয়ন নেই। অন্যদিকে বছর চলাকালে শ্রম মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, আরএমজি খাতে ১,০০৬টি সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং ১,৯৫১টি অংশগ্রহণ কমিটি রয়েছে। শ্রমিক নেতারা দাবি করছেন, ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা আরো অনেক কম। সম্ভবত ৮০ থেকে ৯০টি সক্রিয় ইউনিয়ন রয়েছে। তাদের মতে ভয়ভীতি প্রদর্শন, দুর্নীতি এবং সহিংসতা অব্যাহত থাকায় এর মধ্যে মাত্র ৩০ থেকে ৪০টি প্রকৃতপক্ষে দরকষাকষিতে অংশ নিয়েছে। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, চিংড়ি খাতে ১৬টি ইউনিয়ন রয়েছে। অন্যদিকে, পুরো ট্যানারি খাতের একটিমাত্র ইউনিয়নের অধীনে রয়েছে মাত্র ৭০টি কারখানা। চা খাতেও রয়েছে মাত্র একটি ইউনিয়ন যা দেশের বৃহত্তম। ৯৫,০০০ থেকে ১,০০,০০০ শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে ইউনিয়নটি। শিল্প,

খাতওয়ারি এবং জাতীয় পর্যায়ে  যৌথ দরকষাকষির জন্য কোনো সুস্পষ্ট আইনি ভিত্তি নেই।

শ্রম অধিকার সংগঠনগুলো জানিয়েছে, আইন অনুসারে নিজেদের অধিকার দাবি করার জন্য শ্রমিকদের নিয়মিতভাবেই প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ড এবং সহিংসতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এরকম অধিকারের মধ্যে রয়েছে, ইউনিয়ন সংগঠিতকরণ , উদ্বেগ প্রকাশ করা বা এমনকি ইউনিয়ন তথ্য অধিবেশনে যোগ দেওয়ার মতো বিষয়গুলোও। যেমন- বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এবং অন্য কয়েকজন ইউনিয়ন নেতা ও সদস্যের বিরুদ্ধে ৬ আগস্ট একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে বাংলাদেশ শিল্প পুলিশ (বিআইপি)। সলিডারিটি সেন্টার একে সংগঠিত হওয়ার প্রচেষ্টার কারণে দায়ের করা প্রতিশোধমূলক মামলা হিসাবে চিহ্নিত করেছে। গাজীপুর শহরের ক্রসলাইন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা দুটি ইউনিয়ন নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হন। তারা কারখানাটির কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলেন। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই গভীর মতপার্থক্য থেকেই ঘটে প্রতিবাদ, দুই পক্ষেই সহিংসতা এবং বিআইপির হস্তক্ষেপ। প্রতিক্রিয়া হিসাবে, ক্রসলাইন নিজ কারখানার ২০০ শ্রমিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগে মামলা দায়ের করে। ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত অন্যদের করা হয় বরখাস্ত।

প্রতিবাদ করার অধিকার দাবি করার কারণে ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের পুলিশি সহিংসতা ও গণ বরখাস্তের মুখে পড়তে হয়েছে। ইউনিয়ন নেতাদের গ্রেপ্তারের শিকার হতে হয়েছে। ঘন ঘন আরএমজি খাতের ইউনিয়নের বৈঠকে ও অফিসে গিয়ে, বৈঠকের ছবি তুলে ও রেকর্ড করে এবং ট্রেড ইউনিয়ন সমর্থনকারী এনজিওগুলোর ওপর নজরদারি করে ইউনিয়নগুলোকে ভয় দেখিয়েছে পুলিশ। আইএলও-এর মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় - শ্রম আইনের এরকম বড় অসঙ্গতিগুলোর কথা উল্লেখ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (আইটিইউসি)। সংগঠনটি মজুরি নিয়ে প্রতিবাদ করা শ্রমিকদের ওপর পুলিশি দমন-পীড়নের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ইউনিয়ন নির্বাচনে হস্তক্ষেপ রোধে আরও ব্যবস্থা নেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছে আইটিইউসি।  সেপ্টেম্বরে জেনেভা-ভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন অভিযোগ করে, ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের আঞ্চলিক কমিটি গঠনের প্রাক্কালে পুলিশ প্রথমে কয়েকটি ইউনিয়নের মিটিং নিষিদ্ধ করে। পরে কমিটি গঠনের সময় সভায় যোগ দিতে ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তদের শারীরিকভাবে বাধা দেয়। শ্রম আইন অনুযায়ী, ৫০ জনের বেশি কর্মী থাকা প্রতিটি কারখানায়

একটি অংশগ্রহণ কমিটি (পিসি) থাকা আবশ্যক। তবে আইনে বলা হয়েছে, কোনো কারখানায় নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে অংশগ্রহণ কমিটি থাকবে না। নিয়োগদাতারা নির্বাচন করতে না দিয়ে প্রায়ই পিসির পদগুলোর জন্য কর্মী নিজেরাই মনোনয়ন করেন বা নিয়োগ দেন। পিসি-এর কার্যকারিতা এবং স্বাধীনতার জন্য আইন ও নীতিমালা মেনে চলতেও ব্যর্থ হয়েছেন নিয়োগদাতারা।

বেশ কয়েকটি কারখানার শ্রমিকরা আরো দাবি করেন, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি নিয়ে যাওয়া বা ইউনিয়ন গঠনের চেষ্টা করা শ্রমিকদের কালো তালিকাভুক্ত করতে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) ও কারখানার মালিকরা আরএমজি শ্রমিকদের একটি ডেটাবেজ ব্যবহার করে আসছেন আগস্ট ২০১৮ থেকে। ডেটাবেজটি মূলত তৈরি করা হয়েছিল ২০১৩ সালের রানা প্লাজা ধসের পরে শ্রমিকদের রেকর্ড রাখার জন্য (এবং ভবিষ্যতে বিপর্যয়ে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করতে)। কিন্তু ডেটাবেজটি ব্যবহৃত হচ্ছে ইউনিয়ন সংগঠক বা ব্যবস্থাপকদের কাছে অভিযোগকারী শ্রমিকদের চিহ্নিত করার জন্য, যাতে তাদের অন্য কারখানায় চাকরি পাওয়া ঠেকানো যায়। শ্রমিক সংগঠনগুলো এমন উদাহরণও দিয়েছে যে, কারখানার মালিকরা ইউনিয়ন নিবন্ধন আবেদন খারিজ করতে বা সংগঠকদের নাম প্রকাশ করতে শ্রম অধিদপ্তরে দশ লাখ টাকা পর্যন্ত (১১,৬২৮ ডলার) দিতে চেয়েছে।

## খ. জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রমে নিষেধাজ্ঞা

দেশের আইন কারাগারের বাইরে সব ধরনের জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ করেছে, কিন্তু সরকার কার্যকরভাবে এ সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করেনি। জোরপূর্বক বা আবদ্ধ শ্রম অপরাধের ফৌজদারি দণ্ড অন্যান্য একই ধরনের গুরুতর অপরাধের দণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জোরপূর্বক শ্রমের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করার পরিদর্শন ব্যবস্থাটি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। সম্পদ, পরিদর্শন, এবং প্রতিকার প্রচেষ্টা অপর্যাপ্ত ছিল। আইনে জোরপূর্বক শ্রমের শিকার ব্যক্তিদেরকে পাচারের শিকার ব্যক্তিদের মতো আশ্রয় ও অন্যান্য সুরক্ষামূলক সেবা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সরকার সবসময় এ ধরনের সেবা দেয়নি।

গত বছর আইন প্রয়োগকারীরা আগের তুলনায় কম তদন্ত পরিচালনা করেছে। শত শত জোরপূর্বক শ্রম ও বাণিজ্যিক যৌন শোষণমূলক ঘটনায় সরকারী কর্মচারীদের জড়িত থাকার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদন অস্বীকার করেছে। সরকার ভুক্তভোগীদের পর্যাপ্ত সুরক্ষা সেবা দেয়নি। ধারাবাহিকভাবে ভুক্তভোগী

শনাক্তকরণ প্রক্রিয়াও অনুসরণ করেনি। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ভুক্তভোগীদের জন্য সরকারি কোনো আশ্রয়কেন্দ্র ছিল না।

কিছু ব্যক্তিকে প্রতারণামূলক নিয়োগের মাধ্যমে বিদেশে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তারা বিদেশে জোরপূর্বক শ্রম ও ঋণ বন্দীর মতো পরিস্থিতিতে পড়ে শোষণের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈধভাবে আরোপিত উচ্চ নিয়োগ ফি এবং অননুমোদিত সাব এজেন্টদের (দালাল) আরোপিত অবৈধ ফি দিতে গিয়ে অনেক অভিবাসী শ্রমিক ঋণে জড়িয়ে পড়েন।

অনেক শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ককে গৃহকর্মীর কাজে এবং আবদ্ধ শ্রমে বাধ্য করা হয়। তাদের সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে নিয়ন্ত্রিত চলাফেরা, মজুরি না পাওয়া, হুমকি এবং শারীরিক ও যৌন হয়রানির শিকার হওয়া (অধ্যায় ৭.গ. দ্রষ্টব্য)। ইটভাটায় আটকে রেখে নির্যাতন করা হচ্ছিল এমন চার শ্রমিককে পুলিশ ২০২০ সালের ডিসেম্বরে উদ্ধার করে এবং ওই ভাটার মালিকসহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করে। ডিআইএফই-এর তথ্যানুসারে, দেশ জুড়ে ২৯৭টি হয়রানির মামলা বিচারাধীন ছিল, এর মধ্যে ১০৬টি মামলা ঢাকায় এবং ৬০টি নারায়ণগঞ্জে বিচারাধীন। এসব মামলার বেশিরভাগই ইট ভাটায় শ্রমিকদের বিনাদোষে গুরুতর আঘাত, হামলা এবং নির্যাতনের জন্য ২৩৬ ধারার দণ্ডবিধির অধীনে দায়ের করা হয়েছে। আইএলও-এর তথ্যানুসারে, ইটভাটার বিভিন্ন কাজে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয়। এ কাজগুলো সম্পন্ন করতে কোনো বিশেষ দক্ষতা লাগে না। ইটভাটা পরিচালক ও তাদের দালালরা দারিদ্র্য-পীড়িত গ্রাম ও নগরের বস্তি থেকে অদক্ষ শ্রমিক সংগ্রহ করে থাকে।

চিংড়ি ও মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, অ্যালুমিনিয়াম ও পোশাক শিল্প, ইটভাটা, শুটকি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং জাহাজ ভাঙা খাতে শ্রমিকদেরকে ঋণভিত্তিক জুলুমের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক শ্রম এবং আবদ্ধ শ্রমে জড়িয়ে ফেলে পাচারকারীরা। এনজিওগুলো জানিয়েছে, পাচারকারীরা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পারাপারে এবং নৌ ঘাটগুলোতেও এ ধরনের শ্রমিক নিয়োগসহ বিভিন্ন তৎপরতা চালানোর সুযোগ পায় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে৷

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা জীবন-জীবিকায় প্রবেশাধিকার না থাকা শরণার্থী শিবিরের নয় লাখ সাত হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা নারী, পুরুষ এবং শিশু জোরপূর্বক শ্রম ও বাণিজ্যিক যৌন শোষণের শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে, বিশেষ করে স্থানীয় অপরাধ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো জানিয়েছে, শরণার্থী শিবিরে প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য পাচারকারীদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছেন কর্মকর্তারা।

পররাষ্ট্র দপ্তরের মানবপাচার বিষয়ক প্রতিবেদনটি দেখুন:

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.

## গ. শিশু শ্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা ও কর্মে নিয়োগের ন্যূনতম বয়স

শিশু শ্রমের সবচেয়ে খারাপ ধরনগুলোর সব কয়টি নিষিদ্ধ করা হয়নি আইনে। বরং আইনটি শিশু শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এর বিধিগুলো কাজের ধরন ও শিশুর বয়সের ওপর নির্ভর করে। আইনটি কাজের ন্যূনতম বয়স ঠিক করেছে ১৪, আর বিপজ্জনক কাজের ন্যূনতম বয়স ধার্য করা হয়েছে ১৮, কোন ব্যতিক্রম ছাড়া । কারখানা বা খনিতে নাবালকরা প্রতি দিন পাঁচ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত এবং অন্যান্য স্থানে প্রতি দিন সাত ঘণ্টা ও প্রতি সপ্তাহে ৪২ ঘণ্টা কাজ করতে পারবে। আইন অনুসারে, প্রতিটি শিশুকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেহবে।

আইন অনুযায়ী, সরকার ৩৮টি ঝুকিপূর্ণ খাত ঘোষণা করেছে যেখানে শিশু শ্রম নিষিদ্ধ, কিন্তু ঝুকিপূর্ণ গৃহস্থালী কাজ, শুটকি প্রক্রিয়াজাতকরণ, ইট তৈরি, পাথর সংগ্রহ এবং ইট ও পাথর ভাঙার মতো খাত ওই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এমনকি যে খাতগুলোকে শিশুদের জন্য ক্ষতিকর ঘোষণা করা হয়েছে সেখানেও শিশু শ্রম রয়েছে। সরকার তালিকার ৩৮টির মধ্যে মাত্র ৮টিকে শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করেছে। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা শিশু শ্রম ও আবদ্ধ শ্রমের সবচেয়ে বড় ব্যবহারকারী খাত হিসেবে গৃহকর্ম, স্থানীয় বাজারের জন্য পোশাক উৎপাদন, শুটকি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ইটভাটার কথা বলেছেন।

সরকার শিশু শ্রম নির্মূল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ও তহবিল যোগানো অব্যাহত রেখেছে। এর মধ্যে আছে স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং তিনশ কোটি টাকার সরকারি অনুদানের তিন বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প, ২০১৮ সালে শুরু হওয়া প্রকল্পটি প্রায় ৯০ হাজার শিশুকে ঝুকিপূর্ণ কাজ থেকে সরাতে পেরেছে। ২০১৯ সালে কর্মসূচিটি এক হাজার দুইশ' ৫৪টি শিশুকে স্কুলে ফিরিয়ে এনেছে এবং তিন হাজার ৫১ টি শিশুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। পাশাপাশি তাদের বাবা মায়ের জীবিকা অর্জনে সহায়তা যুগিয়েছে। জুলাইয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই) জানায়, ২০২০-২১ অর্থবছরে ওই সময়ের মধ্যেই পাঁচ হাজার আটশ' শিশু শ্রমিককে ঝুকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়েছে। অক্টোবরের ২৬ তারিখে, ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নির্মূলে ১১২টি এনজিও-র সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ( এমওএলই)। চুক্তি অনুসারে, প্রকল্পের চতুর্থ ধাপে ক্ষতিকর কাজ থেকে এক লাখ শিশুকে সরিয়ে

আনা হবে। এতে খরচ হবে দুইশ' ৮৫ কোটি টাকারও বেশি (৩৩.১ মিলিয়ন ডলার)।

নগরের বড়, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রয়োগ ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত ছিল। কর্তৃপক্ষ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতের বাইরে শিশু শ্রম আইন খুব কমই প্রয়োগ করেছে। সেগুলোর শাস্তিও অপহরণের মতো অন্যান্য বড় অপরাধের সাজার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ডিআইএফই ৪২টি খাতে শিশু শ্রম আইন প্রয়োগ করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ছয়টি ঝুঁকিপূর্ণ খাত – প্রকৌশল কারখানা, বেকারি, পরিবহন, প্লাস্টিক, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা এবং রেস্তোরাঁ থেকে শিশু শ্রম পুরোপুরিভাবে নির্মূলের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে । শ্রম পরিদর্শকদের জরিমানা আরোপ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি; তাদের শুধু আইনী নোটিশ পাঠানোর এবং আদালতে মামলা দায়েরের ক্ষমতা রয়েছে। এমনকি আদালত জরিমানা আরোপ করলেও তা এতটাই সামান্য যে, শিশু শ্রম সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন ঠেকাতে তা মোটেই যথেষ্ট না।

কৃষি ও অন্যান্য কিছু অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বিপুলসংখ্যক শিশু শ্রমিক নিয়োগ হলেও সেখানে সরকারের কোনো তত্ত্বাবধান নেই। রেস্তোরাঁ, প্রকৌশল কারখানা, স্থানীয় পরিবহন এবং গৃহস্থালি কাজে শিশুদের দৈনিক আট থেকে দশ ঘণ্টা কাজ করার তথ্য পেয়েছে সরকার। সরকার আরো জানিয়েছে, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের শুধু রপ্তানিমুখী আরএমজি, চিংড়ি, ট্যানারি, জাহাজ ভাঙা, রেশম উৎপাদন, সিরামিক, গ্লাস, এবং রপ্তানিমুখী চামড়াজাত পণ্য ও জুতা খাত বাদে প্রায় সব খাতে কাজ করতে দেখা গেছে।

সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশু শ্রম রয়েছে বিড়ি তৈরি, আসবাবপত্র ও স্টিল, দেশলাই, পোল্ট্রি, লবণ, সাবান, কাপড় ও পাট খাতে। এর মধ্যে শুটকি মাছ ও ইট উৎপাদনে জোরপূর্বক শিশু শ্রমও রয়েছে। স্থানীয় বাজারের জন্য প্রস্তুতকৃত পোশাক ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে শিশুরা বিপজ্জনক কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনএর তথ্য মতে, এখানে ৫৮ শতাংশ শ্রমিকের বয়স ১৮ বছরের চেয়ে কম এবং ১৮ শতাংশ শ্রমিকের বয়স ১৫-এর চেয়ে কম।

ঢাকার বস্তির ২৭০০ ঘরে পরিচালিত জরিপের ভিত্তিতে তৈরিকৃত ২০১৬ সালের ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউটের এক প্রতিবেদন অনুসারে, বস্তির ছয় থেকে ১৪ বছর বয়সী ১৫ শতাংশ শিশু পূর্ণকালীন কাজে জড়িত রয়েছে এবং তারা স্কুলে যায় না। এই শিশুরা রাষ্ট্রীয় আইনের বেঁধে দেওয়া ৪২ ঘণ্টার সময় সীমার অনেক বেশি সময় কাজ করছে। ২০০৬ সালে একটি আন্তর্জাতিক

প্রতিষ্ঠানের এক জরিপ অনুসারে, চার লাখেরও বেশি শিশু গৃহকর্মের কাজে যুক্ত ছিল। চামড়া শিল্পে এবং জোর করে ভিক্ষা করানো, মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও বহন করার মত অপরাধ কর্মকাণ্ডেও শিশুদের  শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়।  । পাচারকারীরা ভিক্ষুক চক্রের আয় বাড়াতে শিশুদের নির্যাতন করে।

শরণার্থী শিবিরে থাকা রোহিঙ্গা শিশুরা জোরপূর্বক শ্রমের ঝুঁকির মুখে রয়েছে। রোহিঙ্গা মেয়েদের শিবির থেকে ঢাকা বা বিদেশি রাষ্ট্রে কষ্টকর গৃহস্থালী কাজের জন্য পাচার করা হয়েছে। শরণার্থী শিবিরের বাইরে কাজে নিয়োগ পাওয়া রোহিঙ্গা শিশুরা অনেক কম মজুরি পায় বা আদৌ কিছু পায় না। তাদের কর্মঘণ্টা অত্যন্ত বেশি,কেউবা দোকানে সহায়তাকারী, গৃহকর্মী, জেলে বা রিকশাচালক হিসেবে  আবদ্ধ শ্রমের শিকার হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম দপ্তরের পাওয়া শিশু শ্রমের সবচেয়ে খারাপ ধরন বিষয়ে জানুন:

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings

আর শিশু শ্রম বা জোরপূর্বক শ্রমে তৈরি পণ্যের তালিকা দেখুন এখানে

https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods.

## ঘ. কর্মসংস্থান ও পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য

শ্রম আইন লিঙ্গ ও অক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে মজুরি বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু এতে লিঙ্গ, অক্ষমতা, সামাজিক অবস্থান, জাত, যৌন অভিরুচি বা এরকম বিষয়ের ওপর নির্ভর করে অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়নি। সংবিধানে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে প্রতিকূল বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং স্পষ্টভাবে তা সম্প্রসারিত করা হয়েছে সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে। সংবিধান সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সুবিধার জন্য ইতিবাচক কর্মসূচির অনুমোদন দিয়েছে। আইনে বৈষম্যের জন্য কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রাখা হয়নি। সরকার কার্যকরভাবে আইনটি প্রয়োগ করেনি, এছাড়া একই ধরনের অন্যান্য অপরাধের সাজার সঙ্গে বৈষম্যের শাস্তি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

সাধারণত পোশাক শিল্প নারীদের নিয়োগের বেশি সুযোগ দিয়ে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক পরিসংখ্যান বলছে, পোশাক খাতের শ্রমিকদের বেশিরভাগই নারী। পুরো আরএমজি খাতে জনশক্তির ৫০ শতাংশেরও বেশি নারী। তবে এ বিষয়ে পরিসংখ্যান অনির্ভরযোগ্য এবং তথ্যউপাত্তের স্বল্পতার কারণে এতে তারতম্য অনেক। সাধারণত তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপনা পদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব কম

এবং সচরাচর তারা পুরুষ সহকর্মীর চেয়ে কম আয় করে, এমনকি একই ধরনের কাজ করলেও।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং সেন্টার ফর ইকোনোমিক রিসার্চ অ্যান্ড গ্র্যাজুয়েট এডুকেশন ইকোনোমিক্স ইন্সটিটিউটের ২০১৭ সালের এক গবেষণায় উঠে এসেছে, উৎপাদনশীলতার হার বিবেচনায় নেওয়ার পরও রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় নারীরা তুলনামূলক কম মজুরি পায়। এছাড়া ওই গবেষণা অনুসারে, দক্ষতার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার পরও মজুরিতে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবধান রয়ে গেছে। পুরুষ কর্মীদের উচ্চ গতিশীলতা এর জন্য দায়ী বলে উল্লেখ করা হয়েছে গবেষণায়। এ ছাড়াও বিজিএমইএ–এর সাবেক প্রেসিডেন্ট রুবানা হক একটি ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে মনে করা হয় - নারীরা তৈরি পোশাক খাতের ক্রমবর্ধমান স্বয়ংক্রিয়তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে কম সক্ষম। এ ধারণা থেকে কারখানাগুলো অনেক নারী কর্মীকে ছাঁটাই করেছে। নারীরা কারখানায় যৌন নিগ্রহসহ বিভিন্ন হয়রানিরও শিকার হয়। 'সলিডারিটি সেন্টার' এর সহযোগীরা উল্লেখ করেছে, পোশাক কারখানায় কোনো হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি (এন্টি হ্যারাসমেন্ট কমিটি) নেই। তবে পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন ঘোষণা করেছে, এ কমিটি গঠন নিশ্চিতকল্পে তারা ১,১০০-এরও বেশি কারখানা পরিদর্শন করেছে।

চা শিল্পে নারী শ্রমিকরা বৈষম্যের শিকার হয়। পুরুষ শ্রমিকরা তাদের স্ত্রীদের জন্য চাল রেশন পায়, কিন্তু নারী চা শ্রমিকের স্বামীরা কোনো চাল রেশন পান না, কারণ তাদেরকে নির্ভরশীল হিসেবে ধরা হয় না।

কিছু ধর্মীয়, জাতিগত এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু বৈষম্যের কথা জানিয়েছে, বিশেষ করে ব্যক্তি মালিকানা খাতে। (অধ্যায় ৬ দ্রষ্টব্য)।

বিপজ্জনক কাজে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে আইনে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, নারীরা এ ক্ষেত্রে শিশু-কিশোরদের সমান বিবেচিত হবেন। ফলে তাদের বিপজ্জনক যন্ত্র ব্যবহার, চলমান অবস্থায় যন্ত্র পরিষ্কার করা, একাধিক চলমান যন্ত্রাশের মধ্যে কাজ করা এবং ভূগর্ভে বা পানির নিচে কাজ করা নিষিদ্ধ।

## ঙ. কাজের গ্রহণযোগ্য শর্তাবলী

**মজুরি এবং শ্রমঘণ্টা সম্পর্কিত আইন**: জাতীয় ন্যূনতম মজুরি বোর্ড খাত প্রতি ন্যূনতম মাসিক মজুরি ঠিক করেছে। ন্যূনতম মজুরিতে নিয়মিত মুদ্রাস্ফীতির সমন্বয় করা হয় না, কিন্তু মজুরি বোর্ড মাঝে মাঝে কিছু খাতে মজুরির সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয় সমন্বয় করে। নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির

কোনোটিই নগরে বসবাসকারীদের জীবনযাত্রার পর্যাপ্ত মান দিতে পারেনি, তবে তাদের অনেকেই দারিদ্র্যসীমার উপরে রয়েছে। নির্দিষ্ট ন্যূনতম মজুরি দিতে ব্যর্থ হলে এক বছরের কারাদণ্ড, জরিমানা বা উভয় শাস্তিতে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে এবং নিয়োগদাতাকে অবশ্যই বকেয়া মজুরি শোধ করতে হবে। মার্চে সরকার ন্যূনতম মজুরি নীতিমালা অনুসারে মাসিক মজুরি দেওয়ার জন্য আরো সাতটি খাত শনাক্ত করেছে, এগুলো হচ্ছে টাইলস ও সিরামিক, বাণিজ্যিক পার্ক, ব্যাটারি উৎপাদন, শুটকি প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্যক্তি মালিকানাধীনবিমান পরিবহণ, পাথর ভাঙা, এবং তথ্য প্রযুক্তি পার্ক। ন্যূনতম মজুরি নীতির অধীনে রয়েছে ৪৩টি খাত।

আইন মোতাবেক মানসম্মত কর্মঘণ্টা আট ঘণ্টার। মানসম্মত কর্ম সপ্তাহ ৪৮ ঘন্টার। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ের জন্য (ওভার টাইম) ভাতা দেওয়ার মাধ্যমে এটিকে ৬০ ঘণ্টা পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে, । ওভার টাইম ভাতার হার হবে মূল মজুরির দ্বিগুণ। ওভারটাইম বাধ্যতামূলক হবে না। দিনে ছয় ঘণ্টার বেশি কাজ করলে শ্রমিকদের এক ঘণ্টা বিশ্রাম দিতে হবে, পাঁচ ঘণ্টার বেশি কাজের জন্য দিতে হবে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম। আইনে বলা হয়েছে, প্রত্যেক শ্রমিককে বছরে পূর্ণ মজুরিসহ কমপক্ষে ১১টি উৎসব ছুটি দিতে হবে। যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) থেকে থাকলে তার সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়োগদাতা এটি নির্ধারণ করবেন। কারখানার শ্রমিকদের প্রতি সপ্তাহে একদিন ছুটি পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। দোকান শ্রমিকরা প্রতি সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি পান। জোরপূর্বক অতিরিক্ত সময় কাজ করালে (ওভার টাইম) বা অতিরিক্ত সময়ের কাজের মজুরি দিতে ব্যর্থ হলে কী শাস্তি হবে তা শ্রম আইনে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি।

**পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য:**আইনে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার মানদণ্ড স্থির করা হয়েছে। এর সংশোধনীতে শ্রমিক সুরক্ষা কমিটি (সেফটি কমিটি) রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আইন মেনে চলার ব্যর্থতায় কোন ধরনের ক্ষতি হলে sশ্রম আইনে সুনির্দিষ্ট সাজার কথা বলা হয়েছে। যেমন, কারো জীবনহানির ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘনকারীর চার বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা কিংবা উভয়ই হতে পারে; গুরুতর আহতের ক্ষেত্রে দুই বছরের কারাদণ্ড, জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে এবং আহত হওয়া বা ঝুঁকি অমান্যকারীর ক্ষেত্রে ছয় মাসের কারাদণ্ড বা জরিমানা কিংবা উভয়ই হতে পারে। দেশে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক আইন লঙ্ঘনের শাস্তি অবহেলার মতো অপরাধের সাজার সমতুল্য।

শ্রম আইন বাস্তবায়নের বিধিমালায় কারখানায় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটি গঠন প্রক্রিয়ার রূপরেখা রয়েছে। সরকার জানিয়েছে, জুলাই ২০১৮ থেকে ২,১৭৫টি সুরক্ষা কমিটি (সেফটি কমিটি) গঠন করা হয়েছে।

কমিটিগুলোতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক উভয়ের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। শ্রমিকদের মনোনীত করবে সিবিএ। কারখানায় সিবিএ না থাকলে তা করবে শ্রমিকদের 'অংশগ্রহণকারী কমিটি'র প্রতিনিধি। যেখানে ইউনিয়ন বা অংশগ্রহণকারী কমিটি কোনোটাই নেই, সেখানে অংশগ্রহণকারী কমিটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব শ্রম অধিদপ্তরের।

সরকার এ সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করেনি। সমস্যাগুলো কার্যকরভাবে পরিদর্শন ও তার সমাধানের জন্য ডিআইএফই-এর পর্যাপ্ত সংগতি ছিল না। ডিআইএফই এর শ্রম পরিদর্শকরা শুধু নন-ইপিজেড কারখানায় অঘোষিত পরিদর্শন চালাতে পারেন, কারণ ইপিজেড দেখভাল করার একক কর্তৃত্ব শুধু বেপজা'র। ডিআইএফই পরিদর্শকদের সাজা আরোপ করার ক্ষমতা নেই। তারা শুধু লঙ্ঘনকারী কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করতে এবং শ্রম আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। ডিআইএফই নিয়মিতই শ্রম আদালতে আইনের প্রশাসনিক লঙ্ঘনের (যেমন নথি সংরক্ষণে ব্যর্থতা) জন্য নিয়োগকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। শ্রম মন্ত্রণালয় বলেছে, ন্যূনতম মজুরি এবং ওভারটাইম কাজের ভাতা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ডিআইএফই কিছু কারখানার বিরুদ্ধে এ বছর মামলা দায়ের করেছে, তবে শ্রমিক সংগঠনগুলো এ ধরনের কোনো মামলা হতে দেখেনি। ডিআইএফই -এর অভিযোগ ব্যবস্থা নিয়েও সমালোচনা রয়েছে। কোনো একজন শ্রমিককে ডিআইএফই -এর অভিযোগ ফর্মে অবশ্যই তার নাম, পদবি ও পরিচয়পত্র নাম্বার দিতে হয়। এভাবে অভিযোগ পাওয়ার পর এর সূত্র উল্লেখ করে ডিআইএফই কারখানা কর্তৃপক্ষকে চিঠি প্রদান করে। এ পদ্ধতি শ্রমিকদের অপর্যাপ্ত সুরক্ষা প্রদান করে এবং অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থার কার্যকারিতার ব্যাপারেও প্রশ্ন তোলে। মার্চে বেপজা ইপিজেড শ্রমিকদের জন্য হেল্পলাইন টেলিফোন নাম্বার চালু করেছে। অভিযোগ পাওয়ার পর তা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ইপিজেড কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগটি পাঠানোর কথা রয়েছে বেপজার।

পোশাক শিল্পের ওপর বাড়তি মনোযোগ কিছু কারখানার সুরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করতে সহায়তা করলেও সার্বিকভাবে খাতজুড়ে পুঁজি, পরিদর্শন এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না। অনেক আরএমজি কারখানার নিয়োগদাতাই আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও বিপজ্জনক উপাদান সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ বা প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দিতে পারেননি কিংবা কার্যকর সুরক্ষা কমিটির (সেফটি কমিটি) ব্যবস্থা করতে ব্যার্থ হয়েছেন। কর্মঘণ্টার বৈধ সীমা নিয়মিতই লঙ্ঘিত হয়েছে। একটি শ্রম অধিকার বিষয়ক এনজিও দেখেছে, ৯৫ শতাংশ কারখানাই ওভারটাইমের নিয়ম মেনে চলেনি। কোটা পূরণ ও

রপ্তানির সময়সীমা মানার জন্য নিয়োগদাতারা অনেক সময় গর্ভবতী নারীসহ শ্রমিকদের দিনে ১২ ঘণ্টা বা তার চেয়ে বেশি শ্রম দিতে বাধ্য করেছে, কিন্তু তারা সবসময় ওভারটাইমের জন্য শ্রমিকদের যথাযথ পারিশ্রমিক দেয়নি। সলিডারিটি সেন্টারের তথ্যানুসারে, শ্রমিকরা অনেকসময় স্বেচ্ছায় বৈধ সীমার বাইরে গিয়ে অতিরিক্ত সময় কাজ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগদাতারা শ্রমিকদের বেতন দেরিতে দিয়েছেন বা সম্পূর্ণ ছুটি সুবিধা দিতে অস্বীকার করেছেন।

পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ফাউন্ডেশনের করা এক জরিপের তথ্যানুসারে, এ বছর কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় অন্তত ৮৫৩ জন শ্রমিক নিহত এবং ২৩৬ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে, যার বেশিরভাগই ঘটেছে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের এক গবেষণায় উঠে এসেছে, জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে ২৭৬টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনায় ১৪৬ জন শ্রমিক আহত হয়েছে। এসব আন্দোলনের বেশিরভাগই ঘটেছে পোশাক খাতে মজুরি সংক্রান্ত সমস্যা, কারখানা বন্ধ এবং লে অফের কারণে।

জুলাইয়ের ৯ তারিখ ঢাকার কাছে নারায়ণগঞ্জে একটি কারখানায় ভয়াবহ আগুন লেগে ৫৪ জন শ্রমিক নিহত হন। অগ্নি নির্বাপণ কর্মীরা জানান, বাহির হওয়ার প্রধান পথগুলোতে তালা দেওয়া ছিল এবং অনেকে ছয় তলা কারখানাটি থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ে মারা গেছেন। এটি ছিল হাশেম ফুড অ্যান্ড বেভারেজের মালিকানাধীন যা সজীব গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। তদন্তকারীরা কারখানার ভেতরে দুর্বল সুরক্ষা ব্যবস্থা, শ্রমিকদের নিরাপত্তার প্রতি অবহেলা ও উপেক্ষা, অপর্যাপ্ত সরকারি পরিদর্শন এবং শিশু শ্রমের প্রমাণ পেয়েছিলেন। জুলাইয়ের শেষে কর্তৃপক্ষ কারখানার মালিক এম.এ হাশেমকে গ্রেপ্তার করে এবং সাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করে। পরবর্তীকালে ওই আগুনে মৃত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের পরিবারকে দুই লাখ টাকা (২,৩২৬ ডলার) করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মাধ্যমে মালিক আইনি নিরাপত্তা পান। আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের পরিবারগুলো সমস্ত আর্থিক দায় থেকে কারখানার মালিককে অব্যাহতি দেয়।

২০১৩ সালে রানা প্লাজা ভবন ধসের পর বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে ব্যাপক কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা সমস্যা মোকাবেলা করার লক্ষ্যে পশ্চিমা ব্র্যান্ডগুলোর গঠিত দুটি উদ্যোগই ২০২০ সালে এখানে তাদের কর্মকাণ্ড শেষ করে। উচ্চ আদালত নিরাপনকে (সংগঠনটি অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেফটির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং উত্তর আমেরিকার বেশিরভাগ পোশাকের ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করছে) তাদের নিরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ

কর্মকাণ্ড স্থগিত করতে নির্দেশ দেন, একটি পোশাক কারখানা নিরাপনের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য অ্যালায়েন্সের বিরুদ্ধে পুরোনো মামলা আবার চালু করার পরে এ ঘটনা ঘটে।

এছাড়াও আদালতের নির্দেশিত এক সমঝোতা স্মারকের অধীনে 'অ্যাকর্ড অন ফায়ার  অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ' (সংক্ষেপে 'অ্যাকর্ড- যার অধীনে ছিল মূলত ইউরোপীয় ব্র্যান্ডগুলো) তারা নিজেদের কার্যক্রম, কর্মীবাহিনী ও পোশাক খাতের কারখানাগুলোর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সবই হস্তান্তর করে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রেডি-মেড গার্মেন্ট সাসটেইনেবিলিটি কাউন্সিলের কাছে। এ কাউন্সিলের পর্ষদে ছিল পোশাকশিল্প, ব্র্যান্ড এবং ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা। পোশাক কারখানায় নিরাপত্তার মান তত্ত্বাবধান করা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আরএমজি সাসটেইনেবিলিটি কাউন্সিলের (আরএসসি) কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সে বছর 'গভর্নমেন্ট কোঅর্ডিনেশন কাউন্সিল' (জিসিসি) গঠন করে। সরকারের অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে আরএসসি'র কর্মকাণ্ড যাতে সাংঘর্ষিক না হয় তা নিশ্চিত করা, আরএসসির কাজ সমন্বয় করা, অভিযোগের নিষ্পত্তি এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা ছিল জিসিসি'র কাজ।

১ সেপ্টেম্বর তারিখে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকর্ড ফর হেলথ অ্যান্ড সেফটি ইন টেক্সটাইল অ্যান্ড গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি চুক্তি কার্যকর হয়। চুক্তিটি হয় ইন্ডাস্ট্রিঅল, আরেকটি ইউএনআই গ্লোবাল ইউনিয়ন এবং ব্র্যান্ডগুলোর স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে। এর মূল লক্ষ্য অ্যাকর্ডের আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক সুরক্ষা পরিদর্শনের ব্যাপ্তি বাড়ানো, আরএসসিকে সহায়তা করাএবং মজুরি, ক্ষতিপূরণ ও কিছু শ্রমিক-সম্পর্কিত অধিকার অন্তর্ভুক্ত করে সুরক্ষা পরিদর্শনের আওতা বৃদ্ধি করা। ডিসেম্বরের ২২ তারিখ পর্যন্ত ১৬০টি ব্র্যান্ড এই চুক্তির আওতায় নিবন্ধিত হয়েছে।  সরকার আবারো জোর দিয়ে বলেছে যে আরএমজি কারখানার জন্য আরএসসিই একমাত্র পরিদর্শক। অন্যদিকে সেপ্টেম্বরের অ্যাকর্ড চুক্তিতে উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহ প্রত্যাখ্যান করে বিজিএমইএ বলেছে বাংলাদেশে এর প্রয়োগ অবৈধ হতে পারে।

ভবন নির্মাণ বিধির সংশোধনী প্রকাশিত হয়েছে  যা আন্তর্জাতিক অগ্নি নিরাপত্তার মৌলিক মানসমূহ পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং  রপ্তানিমুখী পোশাক খাতের বাইরে ভবন নিরাপত্তায় সরকারি নজরদারি ছিল সীমিত ব্র্যান্ডগুলোর নেতৃত্বাধীন অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্স কর্মসূচি ২,৩০০টি আরএমজি কারখানার কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নত করলেও নিরাপত্তা নিরীক্ষকরা জানান, স্থাপনের পরে যথাযথভাবে

রক্ষণাবেক্ষণ না করায় এই কারখানাগুলোর অগ্নি শনাক্তকরণ বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রায়ই ঠিকমতো কাজ করতো না। অভ্যন্তরীণ বাজার বা অন্যান্য বিদেশি বাজারে রপ্তানির জন্য পোশাক উৎপাদন করা আরো বেশ কয়েকশ' আরএমজি কারখানা সরকারের 'ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ' নামক উদ্যোগের আওতায় পড়ে, তবে ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে উদ্যোগটি সুরক্ষামূলক প্রতিকার প্রশ্নে খুব একটা অগ্রগতি করতে পারেনি। 'ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ' এর আওতাধীন কারখানাগুলো তত্ত্বাবধান এবং পর্যায়ক্রমে দেশের পুরো শিল্পখাতের জন্য ডিআইএফই একটি 'শিল্প সুরক্ষা ইউনিট' তৈরি করছিল এবং ২০২২ সালে এর যাত্রা শুরু করার কথা ছিল। 'রিমেডিয়েশন কোঅর্ডিনেশন সেল' ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে ১০৫টি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন শনাক্ত করেছে।

**অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত:** দেশের বেশিরভাগ শ্রমিকের কর্মসংস্থান করা বিশাল অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সম্পর্কে সামান্যই নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায় এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান শ্রম আইনের আওতাভূক্ত নয়। ২০১৬-২০১৭ সালের লেবার ফোর্স সার্ভে'র তথ্যানুসারে দেশের ছয় কোটি দশ লাখ শ্রমিকের ৮৫ শতাংশই ছিল অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। প্রায় ৯২ শতাংশ নারী এবং ৮২ শতাংশ পুরুষ অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে যুক্ত। নগর এবং গ্রামীণ দুই অঞ্চলেই নারী এবং তরুণদের মধ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বেশি ছিল। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রায় অর্ধেক শ্রমিকেরই কোনো ধরনের পড়ালেখা করার সুযোগ হয়নি।